তৃতীয় অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনারীতি

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের গল্প বলা ও শোনার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল। সেই গল্পে ঘটনার মালা গেঁথে কোন এক বা একাধিক চরিত্র কিংবা অভিব্যঞ্জনাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হত। যেকোন আখ্যানের গঠন প্রক্রিয়ায় 'এরপর কী হল' এই কৌতূহলটা প্রধান থাকে, নতুবা 'কেন এমন হল' এই জিজ্ঞাসাটাই গুরুত্ব পায়। আখ্যানের গঠন প্রক্রিয়ায় এই দুই রীতি নির্মাণতত্ত্বের গোড়ার কথা। প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষের গল্পে ঘটনার ক্রমান্বয়িক সজ্জাটাই সম্ভবত গুরুত্ব পেয়েছিল। অন্যদিকে, পরবর্তীকালের মানুষের গল্পে এসেছে মননের সূক্ষ্মতা। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিও এরূপ আখ্যানধর্মী ও বর্ণনাত্মক। এ ধরনের কাব্যে কবিকে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির তুলনায় বিষয় ও সমাজকে বেশি প্রাধান্য দিতে হত। সেখানে একটি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে কাহিনী গ্রন্থন করা হত। কাহিনী গ্রন্থনায় আধুনিক কবিদের মত মধ্যযুগের কবিদের স্বাধীনতা ছিল না। সমাজ ও ধর্মগোষ্ঠীর চাপ কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে কবিদের প্রভাবিত করত। ফলে একটি প্রথাগত Form-কে কেন্দ্র করে তাঁরা কাব্যের মূল উদ্দেশ্যকে পরিণতি দিতেন। মধ্যযুগের কাব্যে সেই উদ্দেশ্য হল দেব-দেবীর পূজা প্রচার। এই উদ্দেশ্যকে উপস্থাপনের জন্য কবিরা কাহিনী গ্রন্থনায় কতগুলি বিষয় বা ঘটনাকে তুলে ধরতেন। আবার সেই ঘটনাগুলিকে চরিত্র দ্বারা গতিশীল করে তোলা হত। কবি ঘটনা ও চরিত্র সমন্বিত তাঁর কাহিনীকে শিল্প সম্মত রূপ দান করে থাকেন। প্রসঙ্গত, অ্যারিস্টটল চরিত্রের তুলনায় কাহিনী গ্রন্থনা বা প্লট (Plot)-কেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন— ".... to inquire into the structure of the plot as requisite to a good poem."[১] কাহিনী ঘটনা-সংস্থানানুযায়ী বিবৃত হয় এবং চরিত্র তার প্রধান উপাদান। কাহিনীকে গড়ে তোলা হয় বাস্তব সম্মত করে। তাতে কবির ঘটনা বর্ণনার কৌশল ও রীতি পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি অলৌকিক দেবদেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত। সেই দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে যে কাহিনীগুলি মঙ্গলকাব্যে ভীড় করে তা জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে— ''এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালে উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। ... দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ

করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নেই।"[২] তিনি উপন্যাসের অন্যতম উপাদান প্লটকে বেশি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বস্তুতঃ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের প্লটকে মধ্যযুগের প্লট বা কাহিনী গ্রন্থনায় প্রয়োগ করেছেন। আমরাও মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে নাটকের কাহিনী গ্রন্থনার তুলনায় উপন্যাসের কাহিনীর রীতিকে বেশি গুরুত্ব দেব।

বস্তুতঃ কাহিনী গ্রন্থনা বা প্লটের ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিভাষা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। যেমন— গল্প বা কাহিনী (story), ঘটনা (action/envent) ও বিষয় (theme) প্রভৃতি। এদের সমন্বয়ে প্লট গঠিত। প্লট সম্বন্ধে J.A. Cuddon বলেছেন— "The plan, design, scheme or pattern of envents in a play, poem or work of fiction; and, further, the organization of incident and Character in such a way as to induce curiosity and suspense (q.v.) in the spectator or reader."[৩] কিন্তু অ্যারিস্টট্‌ল নাটকের ট্র্যাজিডির প্লট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, প্লটে (১) সমগ্র ও সম্পূর্ণ কাহিনী থাকবে এবং তা হবে সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকীয়তা নীতি মেনে ঘটনার পারম্পর্য বর্ণনা। তাঁর কথায়— "A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. ... that the sequence of events, according to the law of probability or necessity, will admit of a change from bad fortune to good, or from good fortune to bad."[৪] (২) সমগ্র কাহিনীর মধ্যে ঐক্য থাকবে যা অনিবার্যভাবে গ্রথিত, একটু অংশ বাদ দিলে যেন তার সমগ্রতা কাহিনী থেকে অসংলগ্ন হয়ে যায়। এই সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন— "Unity of plot does not, as some persons thinks, consist in the unity of the hero. For infinitely various are the incidents in one man's life ... so the plot, being an imitation of an action, must imitate one action and that a whole, the structural union of the parts being such that, if any one of them is displaced or removed, the whole will be disjointed and disturbed. For a thing whose presence or absence makes no visible difference, is not an organic part of the whole."[৫] (৩) বিষয়বস্তু হবে একক, সম্পূর্ণ, অখণ্ড এবং আদি-মধ্য ও অন্ত্য সমন্বিত। তিনি বলেছেন — "It should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning, a middle, and an end."[৬] অর্থাৎ ঘটনার বিন্যাস প্রক্রিয়াকে সাধারণত কাহিনী গ্রন্থনা বলে। কাহিনী কতগুলি ঘটনার হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সেই ঘটনাগুলির যোগসূত্র কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে। ঘটনার পারম্পর্যের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ বা কৌতূহল থাকে। গল্পের

ক্ষেত্রেও এই কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। তবে গল্প প্লটের মত কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ ঘটনার সমষ্টি নয়। E.M. Forster গল্প ও প্লটের মধ্যে পার্থক্য করে বলেছেন— "We have defined a story as a narrative of events arranged in their time-sequence. A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality."[৭] প্রসঙ্গত তিনি সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন— " 'The king died and then the queen died,' is a story. 'The king died, and then the queen died of grief,' is a plot. The time-sequence is preserved, but the sense of causality overshadows it. Or again : 'The queen died, no one knew why, until it was discovered that it was through grief at the death of the king.' This is a plot with a mystery in it, a form capable of high development. It suspends the time-sequence, it moves as far away from the story as its limitations will allow. Consider the death of the queen. If it is in a story we say 'and then?' If it is a plot we ask 'why?' "[৮] গল্পের দাবি কালানুক্রমে সাজানো ঘটনা স্রোতের প্রতি কৌতূহলটুকুর উপর। কিন্তু প্লটের দাবি শ্রোতার বুদ্ধির (Intelligence of memory) কাছে এবং ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কার্যকারণগত যোগটি মনে রাখার সামর্থ্যের উপর। তবে অহেতুক ঘটনাকে রহস্যের দ্যোতনা (Mystery) দ্বারা জটিল করা শিল্পের পক্ষে হানিকর। একাধিক রহস্যের সৃষ্টিকারী ঘটনা suspence সৃষ্টি করে। তা পাঠকের বুদ্ধির কাছে কোন সমর্থন রাখে না, আবেগপ্রবণ হৃদয়কে আকর্ষণ করে মাত্র। E.M. Forster বলেছেন— "Mystery is essential to a plot, and cannot be appreciated without intelligence."[৯] প্লটে কাহিনীর বিন্যাসের অনিবার্যতা একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত সময় বা পরিস্থিতিতে বা ঘটনায় সেই উপযোগী চরিত্রের অবতরণ অনিবার্য। তবেই কাহিনীর প্রতিটি অংশের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। কাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকবে। এই প্লট বা কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী (Subplot) কথাটি যুক্ত রয়েছে। উপকাহিনী সাধারণত একটি প্রধান কাহিনীকে ঘটনা, পরিবেশ ও সমস্যানুযায়ী বিকশিত করে তোলে। উপকাহিনীর মৌল দায়িত্ব প্রধান কাহিনীকে শিল্প পরিণতি দেওয়া। মূল কাহিনীর সূচনার পর তাকে বিভিন্ন ঘটনাস্রোত ও বিচিত্র পরিবেশে উপস্থিত করে বিশেষ একটি বা কয়েকটি মানুষের জীবনের পরিচয় দেওয়া উপকাহিনীর মুখ্য কাজ। উপকাহিনী পরাশ্রিত বলে অধিকাংশ স্থলে অসম্পূর্ণ থাকে। কখন কখন উপকাহিনী সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তার আবেদন মূল কাহিনীর তুলনায় বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উপকাহিনী গল্প হিসাবে পরিবেশিত হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে তার যুক্তিসিদ্ধ ঘটনা পরম্পরার সম্পর্ক বজায় রাখে। উপকাহিনীর সমস্ত ঘটনাগুলি যেন বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে

উদ্ভুত হয়ে শুধু নবত্বই নয় — পাঠকের রসচৈতন্যকে জাগ্রত করতে পারে। এই উপকাহিনী শিথিল কিংবা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তা নির্ভর করে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-কৌশলের উপর। আবার ঘটনার জটিলতা অনুযায়ী নির্ভর করবে এর কাহিনীর শিথিলতা হবে, না ঐক্যবদ্ধ হবে। উপকাহিনীর ঐক্য গড়ে ওঠে মূল কাহিনীর মত ঘটনা বা চরিত্রের দ্বারা। সেই ঘটনাগুলির সঙ্গে চরিত্রের সমন্বয় ঘটলে উপকাহিনী ঐক্য লাভ করে।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্য সমালোচক অলোক রায় সম্পাদিত 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'প্লট' প্রবন্ধে শ্যামাপ্রসাদ সরদার প্লটের কয়েকটি ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন — (১) অনিবার্য অনুযায়ী প্লট দুই প্রকার — শিথিল প্লট বা লুজ প্লট এবং দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট; (২) ঐক্য অনুযায়ী — সরল প্লট ও যৌগিক প্লট; (৩) উপস্থাপন অনুযায়ী — প্যানরামিক প্লট ও সীনিক প্লট এবং (৪) বিন্যাস বা গঠন অনুযায়ী — বৃত্তাকার প্লট, পন্থাকার প্লট ও হর্ম্যাকার প্লট প্রভৃতি।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের শিথিল প্লটের কাহিনী বা গল্পের প্রতি আকর্ষণ বেশি ছিল। E.M. Forster এধরনের প্লটকে গল্প বলেছেন। তাঁর মতে জটিল প্লটই হল প্রকৃত প্লট। শ্যামাপ্রসাদ সরদার শিথিল প্লট সম্বন্ধে বলেছেন — "যে উপন্যাসের গঠন শিথিল সেখানে কয়েকটি প্রায়বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমবায়ে কাহিনী গঠিত হয়, তাদের মধ্যে কার্যকারণের বা যুক্তিগ্রাহ্য যোগ সূত্র প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে।"[১০] চরিত্রকে মহান শক্তিশালী বা আদর্শবান প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত কাহিনীর অবতারণা করা হয়ে থাকে। ফলে এখানে চরিত্রই বড় হয়ে ওঠে। তাই কাহিনী গ্রন্থনা তার অনিবার্যতার গুণ হারায় এবং ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। এধরনের প্লটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির পরিচয় থাকলেও সামগ্রিক ভাবে প্লটের আবেদন রক্ষা করতে পারে না। এ ধরনের প্লটে কালগত বিবর্তনের স্থানে স্থানগত প্রাপ্তিই প্রাধান্য পায়। আবার, লুজ বা শিথিল কাহিনী গ্রন্থনে এমন অনেক ঘটনা থাকতে পারে যা প্লটের লক্ষণাক্রান্ত। অনেক সময় দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন প্লটের মধ্যেও এমন কিছু ঘটনার অবতারণা করা হয় যার কোন নিজস্ব মূল্য নেই, কিন্তু মূল কাহিনী বিকাশে তা সহায়ক। কথাসাহিত্যের সমালোচক অলোক রায় তাঁর 'চরিত্র' প্রবন্ধে দৃঢ়সংবদ্ধ প্লটের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন — "দৃঢ়সংবদ্ধ-গঠন (অরগানিক্ প্লট) উপন্যাসের কাহিনী পূর্বপরিকল্পিত, এবং প্রায়শই প্লটের গঠন সেখানে বৃত্তাকার। ফলে চরিত্রের বিকাশও পূর্বনির্ধারিত, তার মধ্যে আকস্মিকতার সম্ভাবনা অনেক কম, কালপারম্পর্যও সেখানে সুবিন্যস্ত।"[১১] এধরনের কাহিনী গ্রন্থনায় এমন কিছু চরিত্র বা ঘটনা বা পরিস্থিতির সংযোগ ঘটানো হয় যা গ্রন্থটির সামগ্রিক বিচারে কাহিনীর সৌন্দর্যস্রষ্টা ও আলোকবর্তিকা। দৃঢ়পিনদ্ধ প্লটে স্থানগত ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত কম, কালগত বিবর্তনের প্রাধান্য পায় বেশি। আবার এমন অনেক গ্রন্থ আছে যেগুলি শিথিল ও দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনী গ্রন্থনার মধ্যবর্তী শ্রেণীর। সেক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনার প্রবেশও ঘটতে পারে।

তবে কাহিনী গ্রন্থনায় তার স্বাভাবিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করা জরুরী। বস্তুত কাহিনী গ্রন্থনায় শিথিল ও দৃঢ়পিনবদ্ধ গঠনরীতি ব্যাপারটা আপেক্ষিক। কাহিনী গ্রন্থনায় শিথিল প্লটের গুরুত্ব কম। তাই দৃঢ়পিনদ্ধ গঠনের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এধরনের প্লট দুই প্রকার — গ্রীক্ গঠনশৈলী ও গথিক গঠনশৈলী। গ্রীক্ গঠনশৈলীতে একটি ঘটনা, দৃশ্য বা পরিস্থিতির সঙ্গে অপরটি আটোসাটো ভাবে সংযুক্ত থাকে। সমগ্র কাহিনী বস্তুর থেকে এতটুকু অংশ স্থানচ্যুত করলে কাহিনী গ্রন্থনার প্রাণহীন হয়ে পড়ে। আর গথিক গঠন শৈলীতে এমন কিছু চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য ও পরিস্থিতি থাকে যা সমগ্র কাহিনী বা মূলকাহিনীকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক রূপে কাজ করে। মূলকাহিনীর থেকে এরূপ দু'একটি দৃশ্য, ঘটনা ও চরিত্র বিচ্ছিন্ন করলেও মূলকাহিনীর অপমৃত্যু ঘটে না। এইরূপ দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনী গ্রন্থন পদ্ধতিকে গ্রীক ও গথিক স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

কাহিনীর ঐক্যের দিক দিয়ে প্লট দু'রকমের — সরল প্লট ও যৌগিক প্লট। এই দু'ধরনের প্লটের কথা অ্যারিস্টটল প্রথম তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে বলেছিলেন। সরল প্লটে একটি মাত্র কাহিনী বিবৃত হয়। মূল কাহিনীর পাশাপাশি কোন উপকাহিনী থাকে না। ফলে সরল কাহিনী গ্রন্থনায় কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি হয় না। অ্যারিস্টটল বলেছেন — "Plots are either simple or complex, for the actions in real life, of which the plots are an imitation, obviously show a similar distinction. An action which is one and continuous in the sense above defined, I call simple, when the change of fortune takes place without Reversal of the situation and without Recognition."[১২] এই প্লটের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ তুলনামূলক কম। আর যৌগিক প্লটে একটি প্রধান কাহিনীর চারপাশে আরো অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা অপ্রধান কাহিনীর সঞ্চার হয়। এই ক্ষুদ্র বা অপ্রধান কাহিনীগুলি মূল বা প্রধান কাহিনীর সমান্তরাল বা বৈপরীত্যে শেষে মূল কাহিনীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ লাভ করে। জটিল বা যৌগিক প্লট সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "A complex action is one in which the change is accompanied by such Reversal, or by Recognition, or by both. These last should arise from the internal structure of the plot, so that what follows should be the necessary or probable result of the preceding action."[১৩] মূলকাহিনীর সঙ্গে এই অপ্রধান কাহিনীগুলিকে উপকাহিনীও বলা হয়ে থাকে।

উপস্থাপনা পদ্ধতিগত দিক দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ সরদার প্লটের দুটি ভাগের কথা বলেছেন। যথা, প্যানরামিক (Panoramic) ও সীনিক (Scenic)। প্যানরামিক প্লটের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ সরদার বলেছেন — ''প্যানরামিক প্লটের গঠনকৌশল শিথিল বিন্যস্ত, একটি মাত্র সূত্রে কেন্দ্রীভূত

নয়। ঘটনাগুলি চরিত্রের স্বভাব ও পরিস্থিতির সঙ্গে আংশিকভাবে কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। কাহিনীর গতিবেগ মৃদু হয়ে যাওয়ায় বা ক্রম-ক্ষীয়মান অবস্থায় যবনিকাপাত ঘটে।"[১৪] এই ধরনের প্লট কাহিনী-গ্রন্থনা অনিবার্য, যুক্তিগ্রাহ্য ও নাটকীয়তা পূর্ণ নয়। এখানে চরিত্রের সংখ্যা বহু। তাদের অধিকাংশ চরিত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বর্জিত টাইপচরিত্র মাত্র। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে তাদের কোন ভূমিকা নেই। এ ধরনের প্লটে ঘটনা বিন্যাস বিস্তৃত ও শিথিল, কোন একটি সূত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রথিত নয়। কাহিনী ও ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে কার্যকারণ সূত্রে বিন্যাস ঘটে না। পরিণতিতে কাহিনী কোন নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছায় না। এই প্লটের আয়তন মহাকাব্যধর্মী ও বৃহৎ। অন্যদিকে, সীনিক প্লটে বিশেষ একটি দিককে আলোকপাত করাই লেখকের লক্ষ্য হওয়ায়, এখানে জীবনের বিশাল পটভূমি বর্জিত হয়। প্যানরামিক প্লটের মত এর পটভূমি বিস্তৃত নয়। একটি মাত্র সূত্র বিন্যাস কাহিনীতে কেন্দ্রীভূত হয়। কাহিনীর সূচনায় ঘটনা ও চরিত্রের ঘাতে প্রতিঘাতে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং তার একটি অনিবার্য পরিণামের মধ্য দিয়ে প্রশান্ত সমাপ্তি লাভ করে। এমনকি এ ধরনের প্লটে চরিত্রের সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক পরিপূরক ভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রথম থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এধরনের প্লটে চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বিন্যস্ত থাকে। জীবনের সুবিস্তৃত বৈচিত্র্যের পরিবর্তে কোন একটি বিশেষ প্রবণতার উপর আলোকপাত করে। 'সীনিক' প্লট নাটকীয় ও আকারে সংক্ষিপ্ত।

বিন্যাসপদ্ধতির দিক থেকে প্লট তিন প্রকার বৃত্তাকার, পন্থাকার ও হর্ম্যাকার। এধরনের প্লটের কথা আমরা শ্যামাপ্রসাদ সরদার ও কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের প্লটের আলোচনায় পাওয়া যায়। সাহিত্যের রূপ-রীতির লেখক ও ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকার কুন্তল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — " 'বৃত্তাকার' প্লট দৃঢ়সংবদ্ধ : একটি কেন্দ্রীয় বীজকে গঠনরূপের অন্তঃসার হিসেবে ধরে ঐ বীজটির ক্রমবিকাশের একটি পূর্ণ-বলয়িত বিন্যাস গড়ে তোলা হয়; স্থান-কাল-ঘটনার সামঞ্জস্যে, আদি-মধ্য-অন্ত-সম্বলিত একটি কাহিনী অনিবার্য ও সুস্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছায়।"[১৫] বৃত্তাকার প্লটে আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত এক কেন্দ্রীয় কাহিনী থাকে। একটি বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। লেখক সেই ঘটনার দিকে বেশি দৃষ্টি রাখেন। সেই ঘটনাকে যুক্তিগ্রাহ্য ও অনিবার্য স্পষ্টরেখায় সমাপ্তির দিকে কাহিনীকে অগ্রসর করে তোলেন। এই জাতীয় বৃত্তাকার কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে নাটকীয়তার ঐক্য বিদ্যমান। অন্যদিকে, কুন্তল চট্টোপাধ্যায় পন্থাকার প্লটের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন — " 'পন্থাকার প্লট শিথিলগঠন : জীবনের টুকরো ছবি, একটি ভাবদৃষ্টি ও কিছু চরিত্রের সমাহারে সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত তার গতি। কোন এক পান্থজনের জীবনপরিক্রমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা গ্রথিত হয়ে এ প্লটের নির্মাণ।"[১৬] পন্থাকার প্লটের কাহিনীর গ্রন্থনা শিথিল। কয়েকটি টুকরোটুকরো দৃশ্য বা কয়েকটি চরিত্র বা কয়েকটি ছবিকে একসূত্রে গ্রন্থনা করা হয় এখানে। তার মাঝখান থেকে কোন দৃশ্য বা চরিত্র বা ঘটনা তুলে নিলেও কাহিনীর মধ্যে

বিচ্ছিন্নতা আসে না। হর্ম্যাকার প্লটের গঠন প্রকৃতি জটিল। হর্ম্যাকার প্লট সম্বন্ধে কুন্তল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — ‘‘হর্ম্যাকার প্লট জীবনের বিস্তৃত প্রেক্ষিতে নির্মিত এক জটিল গঠনরূপ। মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর সংযোগে, বহু সংখ্যক ও বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে, ঘটনা ও পরিস্থিতির বৈচিত্র্যে ‘হর্ম্যাকার’ প্লট একটি আশ্চর্য অর্কেস্ট্রা যেন; এর বিন্যাস একই সঙ্গে সুসংবদ্ধ ও শিথিল।’’[১৭] মূলকাহিনীর পাশাপাশি দু’একটি উপকাহিনীর সংযোগ থাকে। বিস্তৃত পটভূমিকায়, বিচিত্র ও বহু চরিত্রের, বহু ঘটনার সমাবেশ এই ধরনের প্লটকে একই সঙ্গে দৃঢ় পিনদ্ধ ও শিথিলগুণের অধিকারী করে তোলে। সে যেমন প্লটই হোক তাকে যেন চরিত্র ও কাহিনীর সম্পর্ক অন্বিত হয়। তার সঙ্গে স্থান, কাল ও পাত্র — এই ত্রয়ী ঐক্য বজায় থাকে। স্থানের সঙ্গে কাহিনীর কাল বা সময়ের সঙ্গে কাহিনী, পাত্র-পাত্রী বা চরিত্রের সঙ্গে কাহিনীর বিন্যাস পদ্ধতির সামঞ্জস্য থাকে, তবেই একটি জীবন্ত প্লট বা কাহিনী গ্রন্থনা হতে পারে।

লক্ষণীয়, প্রায়ই একটি মাত্র ঘটনা বা চরিত্র বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্লট রচনা শুরু হয়। লেখক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে বা কোন লোকমুখে শোনা গল্পের মধ্য থেকে একটি পরিস্থিতি নির্বাচন করেন এবং সেই পরিস্থিতির বিস্তারের দ্বারা প্লট রচনা করেন। আবার, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেই প্লট রচনা করা হয়। এই ঘটনা জীবনাভিজ্ঞতা জাত হতে পারে। তবে কার্যকারণ সূত্রে তা গ্রথিত হতে হবে। কখন পূর্ব নির্ধারিত কোন কাহিনীর ছক অনুসরণ করেও প্লট রচনা করা হয়। সেক্ষেত্রে চরিত্রের প্রতি প্রাধান্য বেশি; চরিত্র সৃষ্টিতে কাহিনীকে একটু পাল্টে নবরূপ দান করা মাত্র।

এই গঠনতত্ত্বের আলোকে মঙ্গলকাব্য বিচার করার পূর্বে মঙ্গলকাব্যের উৎস ও বর্ণনাকৌশল সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। কারণ কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে কতটা মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে তা জানা যাবে। সেই সঙ্গে কতটা শিল্পসম্মত রূপ পেয়েছে তা নির্ধারণ করা যাবে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীদের মাহাত্ম্য যতই ফেনিয়ে বলা হোক না কেন, সে তো মুখরোচক গল্পই। এই গল্পগুলি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আঙিনায় প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তখন এদের সম্ভবত আকার ছিল ছোট ও অনতিস্ফুট। কিন্তু ক্রমে তা আকারে বৃদ্ধি পায় এবং নানা লক্ষণে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পণ্ডিতদের মতে মঙ্গলকাব্যগুলির যে গল্প রয়েছে তার শৈশব অবস্থার সঙ্গে ব্রতকথার সম্পর্ক এমনই। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ‘‘... ব্রতকথার মৌখিক ধারার উপরই কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের লিখিত ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।’’[১৮] ব্রতকথাগুলির ও মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য একই। উভয়ের লক্ষ্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা। মঙ্গলকাব্যের গঠন বা শরীর সংস্থান সম্বন্ধে এটা ভাবা দরকার, যা মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থনারীতির প্রচলিত ভাবনাকে স্পর্শ করবে।

বিশেষত মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুচ্ছানুসারী। তাঁরা মঙ্গলকাব্যের সাধারণ উপকরণ হিসাবে রারমাস্যা, চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, বিবাহাচারের বিস্তৃত বিবরণ, নানাবিধ বিষয়ে অনাবশ্যক দীর্ঘ তালিকা নির্মাণ ইত্যাদিকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। মঙ্গলকাব্যের গঠনের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ সূত্রকেই সকলে মেনে নিয়েছেন। যেমন — (১) মঙ্গলকাব্যের আখ্যানটি হবে বৃত্তাকার। গল্পের সূচনা ঘটবে যেখানে, অন্তিম সমাপ্তিও ঘটবে সেখানেই। তাই দেখা যায়, প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনী শুরু হয়েছে স্বর্গলোকের বিবরণ দিয়ে; পরে মর্ত্যলোক ঘুরে আবার স্বর্গলোকে গল্প সমাপ্তি লাভ করেছে। (২) প্রতিটি মঙ্গলকাব্যই এগিয়েছে কোন-না-কোন দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। মর্ত্যলোকে তাদের পূজা প্রচার করে একাধিক মানব-মানবী, যারা প্রকৃত পক্ষে দেবলোকবাসী। ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির দেবখণ্ডের শেষে একটা না একটা অভিশাপের প্রসঙ্গ থাকেই, যার কাহিনীকে মর্ত্যমুখী করে তোলা হয়। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয় ব্রত কথাগুলির আখ্যান। এই ব্রতগুলি মঙ্গলকাব্যের মত মর্ত্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তবে মঙ্গলকাব্যের অভিশাপ প্রসঙ্গটি ব্রতকথায় সংযুক্ত ছিল না। (৩) মঙ্গলকাব্যে অভিশাপ দেওয়ার ক্ষেত্রেও শরণ নেওয়া হত সংশ্লিষ্ট চরিত্রটির দোষত্রুটির, নইলে বাস্তবতাবোধ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আগে থাকতে প্রয়োজনীয় আয়োজন করেন কবিরা, যাতে ঘটনাটি আকস্মিকতা দোষদুষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে মানবসংসারের ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাটিকে কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। দেবতারা সদ্‌গুণের হয়েও এক্ষেত্রে ছলনা করতে এবং তুচ্ছ অপরাধে ভয়ানক শাস্তি দিতে পিছপা হয় না। দৈববিধানের অমোঘতার ধারণাও এই ঘটনার ভিতর দিয়ে মানব-মনে পুঁতে দেওয়ার প্রয়াস ছিল। (৪) প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই মিলেছে শিব-প্রসঙ্গ, যা দেবখণ্ডের কাহিনীর বড় অংশ। কোন কোন মঙ্গলকাব্য শিবকেন্দ্রিক পুরাণ কিংবা কালিদাসের কুমারসম্ভবের আশ্রয়ে রচিত হলেও বেশিরভাগ কবিই অনুসরণ করেছেন বাংলার লোকায়ত শিবকে। (৫) মঙ্গলকাব্যের চারটি স্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এগুলি যথাক্রমে — (ক) বন্দনা, (খ) গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, (গ) দেবখণ্ড ও (ঘ) নরখণ্ড। প্রথম দুটি পর্যায়ে গল্পের কোন আভাস পাওয়া যায় না। দেববন্দনার অংশটুকু রচিত হয় মঙ্গলাচরণের লক্ষ্য নিয়ে। দ্বিতীয় পর্যায় গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে প্রায় সব কবিই তাঁদের সমকালীন ইতিহাসকে স্পর্শ করে গিয়েছেন। এই অংশে আবশ্যিক ভাবে এসেছে দৈবাদেশ, পৃষ্ঠপোষক বা প্রভুর আদেশ কিংবা ঐ জাতীয় কোন প্রণোদনার কথা, যার দ্বারা কবিরা কাব্য লিখতে প্রলুব্ধ হয়ে থাকেন। তৃতীয় পর্যায়ে দেবখণ্ডে আখ্যানও কম-বেশি গতানুগতিক। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের দাম্পত্য জীবন অবতারণ করা হয়েছে গল্পরস পিপাসু পাঠকদের জন্য। এবার নরখণ্ডের কথা। এই অংশের গল্পটিই মঙ্গ

লকাব্যের মূল গল্প।

মঙ্গলকাব্যের এই গল্পগুলি বর্ণনাত্মক। মঙ্গলকাব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে — (১) শাস্ত্রীয় উপাদান (২) ঐতিহ্যগত উপাদান ও (৩) কাব্যরচনার সমকালীন বাস্তব উপাদান — এই তিনটি ধরনের উপাদানে সুস্পষ্ট উপস্থিতির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক মিশ্রণের অনুপাত সব কবির কাব্যে একরকম ভাবে পাওয়া যায়না। মনসামঙ্গল কাব্যের হাসান-হোসেনের পালাটি কাব্যরচনার সমকাল থেকে উঠে আসা এক ধরনের বাস্তব উপাদান। এই আখ্যানের জন্ম নিশ্চিত ভাবে তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী পর্যায়ে কোন এক সময়ে হয়েছে। এই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, এই গল্পের আয়োজন অনেক কবিই করেন নি। আবার যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যেও কাহিনীর সমতার অভাব রয়েছে। আরো একটা কথা। মনসামঙ্গলের কেন্দ্রীয় আখ্যান চাঁদ বণিককে ঘিরে দানা বাঁধলেও এতে আরো কতগুলি উপকাহিনী রয়েছে। হাসান-হোসেনের পালা ছাড়া বাকিগুলো হল রাখালদের মনসাপূজা, ধন্বন্তরী ওঝার কাহিনী ও জালু-মালুর উপাখ্যান ইত্যাদি। সমাজে তথাকথিত শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হওয়ার পর চাঁদ বণিকের মতো গণ্যমান্যের দ্বারা দেবী স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিল — এমন একটা সমাজ-অভীপ্সা যেন বেরিয়ে আসে আখ্যান গঠনের পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়, রাখালিয়া উপাখ্যানে দেবী জরতী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশ নিয়ে তিন দিনের উপবাস কাটাতে রাখালদের কাছে দুধ চেয়েছে। কিন্তু রাখালরা সে কথায় আমল দেয়নি। ফলস্বরূপ সর্পদংশনে তাদের বিপুল গো-সম্পদ বিনষ্ট হয়। বিপন্ন গোয়ালারা তখন কাতর হয়ে ক্ষমাভিক্ষা চাইলে ও দেবীর পূজা দিলে পূর্বের গোধন আবার ফিরে পায়। উদ্ধতকে শাস্তি আর অনুগতকে কৃপা — দেবদেবীদের এমন সরলরৈখিক আচরণ ব্রতকথাগুলিতে সহজেই পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, জালু-মালুর গল্পে দেব-বিরোধিতার কোন প্রসঙ্গই নেই। তাই দেবী অকাতরে তার অনুগ্রহ বিতরণ করেছে দরিদ্র জেলেদের প্রতি। এই গল্পগুলিকে সংগঠনের দিক থেকে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বলে গণ্য করা যায়। চাঁদের বিরুদ্ধে মনসার সক্রিয়তা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও ক্রূরকর্মের মধ্য দিয়ে ক্রমশ দ্বন্দ্বে তুঙ্গ স্থান স্পর্শ করেছে। দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছে তীব্র থেকে তীব্রতর। তবে এই ক্রমোন্নতিময় আখ্যানে হঠাৎ ছন্দ-পতন আনে অনিরুদ্ধ-ঊষাহরণ ও যমযুদ্ধের অংশটি। কেমন করে লখিন্দর ও বেহুলা স্বর্গলোক ছেড়ে পৃথিবীতে এল সেই ঘটনাটি বিজয় গুপ্ত এতটা বিশদে বলেছেন, যাতে মূল গল্পের চলমানতা ও সমুন্নত গতি নষ্ট হয়েছে। সংরূপটি মঙ্গলকাব্য হলেও গল্পগঠনের মূল শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ায় কাহিনীও তার প্রার্থিত আবেদন ও আকর্ষণ হারিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় আমরা এই প্রথাগত রীতি (Technique), পুরাণ ও তন্ত্রপ্রসঙ্গ কতটা নিয়ন্ত্রিত করেছে, তা লক্ষ্য করব। সেই সঙ্গে কবির

সামাজিক দায়বদ্ধতা, ধর্মীয় প্রভাব, লোকবিশ্বাস ও সমকালিন মানুষের জীবনের চাহিদা কাহিনী গ্রন্থনে প্রভাবিত করেছে কিনা তার দিকে নজর রাখব।

মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে সূচনা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় এই গ্রন্থন রীতি নতুন। কবি কাব্যের প্রথমেই গায়েনী রীতিতে পদ্যের আদলে কিন্তু গদ্য ভাষায় ধর্মের জন্ম কাহিনী বৃত্তান্ত লোক সম্মুখে বলছেন। গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ‘‘মানিকদত্তের পদ্য, পদ্যের গন্ধযুক্ত গদ্য-রচনামাত্র।’’[১৯] ব্রতকথা শুনলে যে মঙ্গল সাধন হয় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কাব্যের সূচনায়। সেই সূত্রে কবি বলতে চেয়েছেন যে, ধর্ম নামক সত্যের জন্ম কথা শ্রবণ করলে শ্রোতার পাপ ও দুঃখ হরণ হবে।

‘‘মন দিএগ শুন জয় ধর্ম্মের কাহিনী।
দুঃখ খণ্ডে হরে পাপ শুনি আদ্যবানী।।’’[২০]

ব্রতকথার সাধারণ রীতি দ্বারা কাহিনীর সূচনা করে মূল স্রোতে ঘটনা প্রবেশ করেছে। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি কবি লঙ্ঘন করলেও সমকালীন মধ্যযুগীয় বাতাবরণে এরূপ ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা অসঙ্গত নয়। তাতে কাহিনী অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এসেছে। অতীত ঘটনাটি হল আদি বুদ্ধের ন্যায় এই ধর্মের জন্ম শূন্য থেকে এবং তার কোন হাত, পা ও স্কন্ধ ছিল না। হঠাৎ তার সকল কিছু হল। বৌদ্ধধর্মের ‘শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ’ নিরাকার ছিলেন। এই কাব্যেও ধর্ম —

‘‘বাপের বিজ্জ জন্ম নইল না ধরিল মাএ।
শূন্যতে জন্মিল ধর্ম্ম মাংস পিণ্ডকায়।।
*　　　　*　　　　*
হস্ত নাহি পদ নাহি কন্ধে নাহি মাথা।
জে রূপে জন্মিল ধর্ম্ম তার শুন কথা।।
আচম্ভিতে ধর্ম্ম গোলোক ধিআইল।
চক্ষু কান নাক আদি সকল হইল।।’’[২১]

এভাবনা রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’-এ লক্ষ্য করা যায়। শূন্যপুরাণে ধর্মের জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

‘‘দেবতা দেহারা ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ।।
*　　　　*　　　　*
দআর আনে ধর্ম্ম বসিল আপনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বস্তু জানে।।

চৌদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উদ্ধনিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই।।
জনমিআ উল্লুক পক্ষ উড়িআত জাএ।
সূন্যে বৈসি নিরঞ্জন দেখিবারে পাএ।।”[২২]

অতঃপর ধর্ম চোদ্দ যুগ জলের উপর যোগ নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। ধ্যান ত্যাগ করে সামনে প্রাণী জগতের প্রতিনিধি উলুক পাখিকে দেখতে পায়। তার কথায় ধর্ম সৃষ্টি কার্যে মনোনিবেশ ঘটায়। ধ্যান ভঙ্গের সাধারণ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে অপর একটি চরিত্রের সম্মুখীন হওয়া এবং নতুন ঘটনার দিকে কাহিনী-যাত্রার পথ সুগম করা হল।

এরপরই ঘটনায় চরিত্রের সক্রিয়তা এবং ঘটনা নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তাতে ধর্ম কর্তৃক মন্ত্রের দ্বারা পদ্মফুল সৃষ্টি হল। বৌদ্ধ ধর্মে ও বৌদ্ধ শিল্পে পদ্মের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের মধ্যে ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই পদ্ম সৃষ্টির আদি প্রতীক। ধর্মের আদ্যমূল জপ করার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার ‘মূলধার’-এর যোগ আছে বলে মনে হয়। মূলাধারে প্রবৃত্তির অবস্থান। সেই প্রবৃত্তি শক্তি দেহস্থিত আদ্যমূল। করুণাবশত সেখান থেকে সে মৃত্তিকা সৃষ্টি করে তাকে নখ দিয়ে টিপে তিন ভাগ করে। প্রশ্ন হল কেন নখে টিপে ধর্ম মৃত্তিকা তিন ভাগ করে? কারণ হিন্দু ধর্মে নখ, অস্থি ও শবকে অশৌচ বলে মনে করা হয়। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকরা এগুলিকে পরম পবিত্র বলে মনে করে। তাই পবিত্র জিনিসের স্পর্শে পৃথিবী যাতে পুণ্য পবিত্র হয়, সেকারণে হয়তো ধর্ম মৃত্তিকা নখে টিপে পৃথিবী সৃষ্টি করে।

“মন্ত্রের প্রতাপে হৈল কমলের ফুল।
সেইখানে বসি ধর্ম্ম জপে আদ্যমূল।।
মনতে ভাবিএ্যা ধর্ম্ম পাতালে পশিল।
পাতালে জাইএ্যা ধর্ম্ম মৃত্তিকা সৃজিল।।
মৃত্তিকা সৃজিএ্যা ধর্ম্ম হস্ততে রাখিল।
নখের টিপনে মাটি তিন ভাগ কৈল।।”[২৩]

পৃথিবী সৃষ্টি করে ধর্ম তাকে স্থাপন করার জন্য একে একে গজ, কূর্ম অবতার হয়েছে। কিন্তু তারা পৃথিবীর ভার বহনে অসমর্থ হলে ধর্ম নিজের পৈতা ছিঁড়ে বাসুকি নাগের সৃষ্টি করে। তার মাথার উপর পৃথিবীকে স্থাপন করা হল।

এরূপ কাহিনীতে পাঠকের সামনে অলৌকিক গল্পের প্রতি মনসংযোগকারী কয়েকটি ঘটনার উপস্থাপন করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় দেবমাহাত্ম্যমূলক আবহাওয়ায় তা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সেখানে দেখা যায় ধর্মের হাই বা ‘হাম্বি’ থেকে আদ্যার জন্ম। আদ্যাকে দেখে ধর্মের সম্ভোগ বাসনা

জাগ্রত হয় এবং ধর্ম আদ্যাকে ধরার জন্য অগ্রসর হয়। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আদ্যা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দিকে ধাবিত হলে তা থেকে চারটি দিকের সৃষ্টি হয়। এই কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক ও অলৌকিক। তার বাস্তব ভিত্তি নেই। কিন্তু এর সঙ্গে নারীর আত্মসম্মান রক্ষার প্রসঙ্গটির দ্বারা কবি বাস্তবজ্ঞানের যোগসূত্র রক্ষা করেছেন। মধ্যযুগের মানস প্রবণতায় আবদ্ধ অলৌকিক পরিপূর্ণ বর্ণনা কবি দিয়েছেন।

"আদ্যাকে ধরিতে ধর্ম্ম চারিদিকে গেল।
পূর্ব্ব পশ্ছিম উত্তর দক্ষিন সেই হৈতে হৈল।।"[২৪]

এই অলৌকিক সৃষ্টি বর্ণনা ও কাম সম্ভোগের রহস্যের বর্ণনাই পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে বলে মনে হয়। কাম প্রবৃত্তির প্রকাশে ধর্মের বীর্যপাত হয় এবং সেই বীর্য থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জন্ম হয়। জন্মের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জন তপস্যায় মগ্ন হয়। এর কারণ সম্বন্ধে কোন সম্ভাব্য উত্তর নেই। চরিত্র যেন ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছে। তার সূত্র ধরেই তাদের তপস্যার কপটতা পরীক্ষার জন্য ধর্মের শবরূপ ধারণ। কবির বর্ণনাটি এরূপ —

"মায়া করি মরা রূপে ধর্ম্ম ভাসি জাঅ।
জেই ঘাটে ব্রহ্মা জাএ্গা তপস্যা ধিআঅ।।
ভাসিয়া লাগিল ধর্ম্ম ব্রহ্মা দেবের ঘাটে।
তিল কুশ ছাড়িয়া ব্রহ্মা উপর পারে উঠে।।
*　　　*　　　*
ই তিন ভুবন মধ্যে ব্রহ্মা একজন।
চিনিতে না পারে ব্রহ্মা অনাদ্য নিরঞ্জন।।
*　　　*　　　*
মরা দেখি বিষ্ণু তিল কুল ফেলি দিল।
তপস্যার ঘট ছাড়ি উপর উঠিল।।
*　　　*　　　*
মরা দেখি শিব তিল কুল ফেলি দিল।
তপস্যার ঘাট ছাড়ি উপরে উঠিল।
ধ্যান করিএ্গা শিব পিতাকে চিহ্নিল।
মৃত্যু পিতাকে শিব কান্ধে করি নিল।।"[২৫]

এই অংশটুকু রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে —

"তিন ঠাঁই তপিস্‌সা করিল তিন ভাই।
কি দরব্ব পাইলা তথা কহু মোর ঠাঁই।।
বম্ভা বিষ্ঠু বোলে গোঁসাই চিনিতে পারিলাম।
আচম্বিতে পচা গন্ধ নাসাতে পসিলাম।।
ত্রিলোচন বোলে পরভু সুন ভগবান্‌।
তুম্বারে চিনিআ নাম হইল ত্রিনআন।।"[২৬]

তবে কবি মানিক দত্তের কাব্যে এই অংশটুকু বিস্তৃত রূপে বলা হয়েছে। তুলনায় সেইকথা রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে অনেকটাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

কাহিনীতে আদ্যা এবং তার জন্মের কথাকে এত বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন যে অহেতুক কাহিনীতে রহস্য উন্মোচন হয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পিতৃ-আদেশে বিবাহে অসম্মত হলে শিব তার অনুরোধে বিবাহ করতে মনস্থির করে। কিন্তু শিব আদ্যাকে সাতবার দেহ ত্যাগ করার কথা বলেছে। শিব তার প্রমাণ স্বরূপ আদ্যার সাত জন্মের সাতটি হাড় গলায় রাখার কথা বলে। কাহিনী অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই ধর্ম বিশ্বাস একান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়।

"শিব বোলে শুন তুমি   তবে বিভা করি আমি
আদ্যা যদি সাতবার মরে।।
সাতবার মরিব   সাতখান হার লব
হাড়মালা গলাএ পড়িব।
আদ্যা দেহা ছাড়িএঞা   পুনুজন্ম লঅ গিএঞা
তবে তাকে বিবাহ করিবো।।"[২৭]

কবি আদ্যার সাতটি জন্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আদ্যার একে একে ভৃগু মুনির ঘরে, যশোদার উদরে, কুম্ভকারের ঘরে, দক্ষের ঘরে হরের বণিতা সতী নামে, দক্ষযজ্ঞের পর হরিঘরে জন্মের কথা বলার পর তার বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে এইটুকু অংশ বাদ দিলে বোধহয় কাহিনীর কার্যকারণ পারম্পর্য বিঘ্নিত হত না।

তাই কবি আদ্যার ছয়বার জন্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে অনির্বায ভাবে সপ্তম জন্মের কাহিনীতে চলে আসতে পারতেন। কিন্তু কবি মানিক দত্ত এই কাব্যে আদ্যাকেই দুর্গারূপে হিমালয় গৃহে মেনকার উদরে জন্ম গ্রহণ করার কথা বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুযায়ী হয়েছে। জন্মের পর পঞ্চতীর্থের পবিত্রজল দিয়ে তাকে স্নান করানো হল। তার নাম রাখা হল গৌরী। একে একে তার পঞ্চমাসে অন্নপ্রাশন ও পাঁচ বছরে কর্ণভেদ করা হয়।

"দাই আসিএঞা কন্যার নাড়ি ছেদ কৈল।

পঞ্চতীর্থের জল আনি স্নান করাইল।।
শাস্ত্রের বিধান মতে শুধ্বিতা হইল।
গোউরি বুলিঞা কন্যার নাম থুইল।।
এক দুই তিন গৌউরির পঞ্চ মাস হৈল।
পঞ্চ মাসের কালে অন্ন পরাশন কৈল।।
ছয়সাত আটনয় দশ মাস হৈল।
এগার মাসের পরে বছর হইল।।
এক দুই তিন চারি পঞ্চ বছর হৈল।
পঞ্চ বচ্ছরের কালে কন্নবেদ কৈল।।”[২৮]

কবি লৌকিক সংস্কার ও প্রথাগত কাঠামোয় এই বর্ণনা করেছেন। শিব ও গৌরীর মিলনের সূত্রে নারীর শিবতুল্য স্বামী প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার বিশ্বাসকে হর-গৌরীর মিলন ভাবনা গ্রন্থনে সাহায্য করেছে। সেই শিব পূজার মধ্য দিয়ে শিব-গৌরীর সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। কাহিনী এই পর্যন্ত সরল রৈখিক।

এরপরই কাহিনীর মধ্যে একটি উপকাহিনী প্রবেশ করে। সেই উপকাহিনীর চরিত্র হল কামদেব, তার স্ত্রী রতি ও সরস্বতী। কাহিনীর ধারা পরিবর্তনের জন্য তাদের আগমন। তাদের আগমনে কবি কাঙ্ক্ষিত পুরাণের একটি ঘটনাকে কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। সেটি হল তারকাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবকূলকে রক্ষার জন্য শিবপুত্র কার্তিকের জন্ম হওয়ার প্রয়োজন। তাই কবি শিব-গৌরীর বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কারণ সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কবি বলেন —

“দেবগণের তরে ইন্দ্র বলেন বচন।
তারক অসুরের ভএ কাপে দেবগণ।।
ব্রহ্মা বোলে শিবের পুত্র কার্ত্তিক জন্মিবে।
কার্ত্তিকের রণে তারক অসুর মরিবে।।
শিবের বিভা হৈলে কার্ত্তিক জন্মিবে।
শিবের বিভার তরে দেবগণ ভাবে।।”[২৯]

বিবাহের জন্য প্রথমে শিবের ধ্যানভঙ্গ করা প্রয়োজন। তাই কামদেবকে আনা হয়। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করলে কামদেব ভস্মীভূত হয়। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী রতির ক্রন্দন অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। এই পরিস্থিতিতে সরস্বতী তাকে কামদেবের পুনর্জন্মের কথা বলে। এই ঘটনার পরিণতি আকর্ষণীয় ও করুণরসে সিক্ত। সংক্ষিপ্ত পরিসরেই উপকাহিনীটি মনুষ্য জীবনের চরম বাস্তবতাকে পরিস্ফুট

করে তুলতে সাহায্য করেছে। মূল কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে এর যুক্তিসিদ্ধ সুযোগ ও অবসর রয়েছে।

এই উপকাহিনী বিধৃত হওয়ার পর কাহিনী মূল স্রোতে প্রবাহিত হয়। তা কাহিনীর পরম্পরা গুণ রক্ষা হয়েছে। কাহিনী শিব গৌরীর বিবাহের পদযাত্রায় উন্নীত হয়। কঠোর তপস্যারত গৌরীর মানসিক দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করে শিব আনন্দিত হয়। শিব হিমালয় গৃহে ঘটক হিসাবে প্রেরণের জন্য নারদ চরিত্রের কাহিনীতে প্রথম আগমন। হিমালয় কন্যা গৌরীকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হয়। তাই শিব সকল দেবতাদের নিমন্ত্রণ করতে বলে। কিন্তু দেবতারা বলে—

> ‘‘প্রেত ভূত লঞা শিব থাক শ্মশানতে।
> অন্নজল কে খাইবে তুমার গৃহতে।।’’[৩০]

তাই তারা গঙ্গার রান্না ছাড়া অন্ন গ্রহণ করবে না। এই কারণে পুরাণের গঙ্গা ও শান্তনুর দাম্পত্য জীবনের ঘটনা কাহিনীতে প্রবেশ করেছে। উচ্চবর্ণের দেবসমাজের কাছে শিব অপবিত্র, অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণের। তাদের কাছে গঙ্গা পবিত্র। গঙ্গার এই পবিত্র ধারণা ‘বিষ্ণুপুরাণ্‌ম’ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেখানে পরাশর গঙ্গা সম্বন্ধে বলেছে —

> ‘‘শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।
> যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে।।’’[৩১]

(অর্থাৎ, ‘‘প্রতিদিন যাঁহার নাম শ্রবণে, যাঁহার অভিলাষে; দর্শনে স্পর্শনে পানে, অবগাহনে বা কীর্ত্তনে প্রাণিগণ পবিত্র হয়।’’[৩১]) এই পবিত্র গঙ্গার ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত। সেই পবিত্র গঙ্গাকে দিয়ে শিবের বিবাহের রান্নার জন্য শান্তনু মুনির কাছ থেকে শর্ত করে আনা হয়েছিল। শান্তনু মুনি শিবকে শর্ত দেয় যে —

> ‘‘রাত্র মধ্যে গঙ্গা অনিঞা দিহ তুমি।
> প্রভাত হইলে গঙ্গা না লইব আমি।।’’[৩২]

এই প্রসঙ্গে একই কথা শান্তনু শিবকে বলেছিল বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল কাব্যে। সেখানে বলা হয়েছে —

> ‘‘শান্তনু বলেন গোসাঞি শুন ত্রিলোচন
> আজি আনি দিহ গঙ্গা আমার সদন।
> যদি ভাগীরথী আজি বঞ্চেন তথাই
> তবেত গঙ্গারে আমি নাহি দিব ঠাঞি।’’[৩৩]

কিন্তু নারদ চরিত্রের ঝগড়ার বৈশিষ্ট্যকে শিবের শর্ত ভঙ্গের কারণ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। তাই শান্তনু মুনি গঙ্গার চরিত্র ভ্রষ্টের কারণে তাকে পরিত্যাগ করে। শিব বাধ্য হয়ে তাকে মাথায় ধারণ করে। গঙ্গাকে স্বামী শান্তনুর পরিত্যাগের কথা মহাভারতেও রয়েছে। কিন্তু সেখানে শান্তনু

মুনি গঙ্গাকে ত্যাগ করেছে পুত্রদের ভাসিয়ে দেওয়ার কারণে। তাই পুরাণের এই বর্ণনার সঙ্গে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এই অংশের কাহিনীর কোন সাদৃশ্য নেই। বাংলার জনপ্রিয় মৌখিক সংস্কৃতিতে গঙ্গা শিবের স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে। গঙ্গা ও শান্তনুর দাম্পত্যের লোকপ্রচলিত কাহিনীকে এখানে উপকাহিনী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। মূল কাহিনীর প্রধান পুরুষ চরিত্র শিবের সঙ্গে তার সম্পর্কের দিকটিও প্রচলিত সমাজ থেকে সংগ্রহ করা। কবি মানিক দত্ত এভাবে মূল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে লোকপ্রচলিত পুরাণের কাহিনীগুলিকে যুক্ত করে দিয়েছেন।

অতঃপর শিবের অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণকে কেন্দ্র করে নারদের ভীমকে সঙ্গে করে হিমালয় গৃহে যাত্রার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু ক্ষুধাবশত ভীম ও নারদ সেগুলি খেয়ে তার স্থানে কাদা, বালু পূর্ণ করে হিমালয় গৃহে পৌঁছায়। তাতে তাদের প্রতি মেনকার ক্রোধ জন্মানো স্বাভাবিক। তা নিয়ে উভয় পক্ষের ঝগড়াও চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎপর্যপূর্ণ। লোকসমাজে প্রচলিত নারদের ঝগড়া এবং ভীমের শক্তিশালীরূপ কাহিনীর মধ্যে জটিলতা ও হাস্য পরিহাসের সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় এই বিবাহকে সামনে রেখে আরও বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তারা হল হিরা তারা, সুরেশ্বরী, মোহিনী ও পিঙ্গলা প্রভৃতি নারীগণ। তারা গৌরীর বিবাহে জল সাধতে এসেছে। এদিকে শিব হাড় মালা গলায় পরে, সাপ জটায় বেঁধে তার মধ্যে গঙ্গাকে স্থাপন করে এবং শিঙ্গা, বেণু হাতে নিয়ে বৃষের উপর বসে বিবাহে উপস্থিত হয়। বিবাহ সভায় নারদের কথায় শিব শাশুড়ির সামনে উলঙ্গ হয়ে যায়। শিবের এরূপ নগ্ন চেহারা দেখে মেনকা লজ্জিত হয়। 'পদ্মপুরাণ'-এর সৃষ্টিতত্ত্বেও শিবের যে চিত্র অঙ্কিত রয়েছে সেটি হল —

> ''পুরা শর্ব্বঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্টা যুবতীরূপশালিনীঃ।
> গন্ধর্ব্বকিন্নরাণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বতঃ।।১
> মন্ত্রেণ তাঃ সমাকৃষ্য ত্বতিদূরে বিহায়সি।
> তপো ব্যাজপরো দেবস্তাসু সঙ্গতমানসঃ।।২
> অতিরম্যাং কুটীং কৃত্বা তাভিঃ সহ মহেশ্বরঃ।
> ক্রীড়াঞ্চকার সহসা মনোভাব-পরাভবঃ।।৩''[৩৪]

(অর্থাৎ, ''পুরাকালে মহাদেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর এবং মনুষ্যগণের রূপবতী যুবতী স্ত্রীসকল দেখিয়া মন্ত্রবলে তাহাদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অতি দূরে আকাশপথে লইয়া গেলেন। দেবদেব তপস্যাব্যাজে তাহাদের সহিত সংগম করিবার মানসে এক অতিরম্য কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি মনভাবের পরাভব কর্ত্তা হইলেও সেই সকল রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।''[৩৪]) তবে এই চিত্রের সঙ্গে এই কাব্যের চিত্রের একটু তফাৎ রয়েছে। উলঙ্গ শিবকে দেখে এয়োগণ লজ্জিত হয়। তারা শিবের কপালে ফোটা দিতে গেলে সাপ ছোপ মারতে উদ্যত হয়। তা দেখে এয়োগণ তাকে

'বাদিয়া'-র সন্তান বলে সম্বোধন করে। নির্লজ্জ বৃদ্ধ শিব সেই অবস্থায় ডমরু বাজিয়ে হাসতে থাকে এবং তার চারপাশে ভূত-প্রেতও নাচতে থাকে।

''আইল মেনকা রানী জাঙাই বরিতে।
জাঙাই নাঙ্গটা দেখি রহে হেট মাথে।।
শিবের কপালে আইহ ফোটা দিতে জায়।
শিবের জটের সর্প্প ছই দিতে চায়।।
নারীগণ বলে শিব বাদিয়ার পো।
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো।।
এতেক নাঙ্গটা শিব মাথে সাপের জটা।
বর নহে এই শিব বাদিয়ার বেটা।।
শিবকে দেখি নারীগণ দূরতে পলায়।
শাশুড়ের আগে শিব ডমরূ বাজায়।।
বুড়ার বেশ হএগ্রা শিব হাসি ২ পড়ে।
কথা কহিতে শিবের দণ্ড গোলা নড়ে।।
প্রেত ভূত সঙ্গে শিব নাচে চারিপাশে।
শিব চরিত্র দেখি সকলিএ হাসে।।''[৩৫]

পদ্মপুরাণের কাহিনীতে শিব ছিল নারীর শ্লীলতানাশক ও রুদ্র, তার সঙ্গে ছিল পিনাক। সেখানে শিব আর্য সংস্কৃতির বাহক। পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের কবিদের হাতে সে পরিণত হয়েছে শ্মশানচারী বৃদ্ধ, গলায় হাড়ের মালা, হাতে ডমরু ও শিঙ্গা এবং তার বাহন হয়েছে ভূত-প্রেত। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে শিবের আর্যেতর লৌকিক সংস্কৃতির মিলন মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা অসঙ্গত হবে না।

সেই সঙ্গে কাহিনীতে এসেছে বাস্তবতার ছোঁয়া। কন্যার দাম্পত্য জীবনের চরম ভবিষ্যতের কথা ভেবে মেনকা স্বামী হিমালয়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়। মাতা হিসাবে মেনকাই অনুভব করতে পারে সমাজের এই বয়োবৈষম্য বিবাহের পরিণতি। কিন্তু হিমালয় তাকে শিবের মহিমা ও ক্ষমতার কথা বলে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অবলা নারীর মনে বিশ্বাসের দৃঢ় বাঁধ গড়ে ওঠে না। তাই ভবিষ্যতে চরম অশান্তি হওয়ার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয় বলে মনে হয়েছে মেনকার। প্রসঙ্গত, নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — ''শিব-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া সমসাময়িক বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও চিত্তে স্পর্শালুতা প্রত্যক্ষগোচর তেমনই অন্যদিকে বাঙালী চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারীভাবনার প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ।''[৩৬] মধ্যযুগে

অসহায় অবলা নারীর ক্রন্দন ও আত্মহত্যা ছাড়া সুখ-শান্তি-আনন্দের কোন পথ ছিল না বলে মনে হয়। মেনকার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সমাজ বাস্তবতার দিকটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এর পর মুহূর্তেই কবি কাহিনীর গতি পথকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে শাশুড়ির নিন্দায় অসহ্য শিবের রাম ব্রহ্ম মন্ত্র জপের মাধ্যমে মোহনরূপ ধারণ করার প্রসঙ্গটি।

''রাম ব্রহ্ম মন্ত্র শিব হৃদএ জপিল।
কামিনীমোহনরূপ শিব ঠাকুর হৈল।।''[৩৭]

কাহিনীর মোড় ঘোরাতে কবি রাম ব্রহ্মমন্ত্রকে কৌশলে কাজে লাগিয়েছেন। শিবের মত কুলীন বৃদ্ধ মানুষের কাছে রাম ব্রহ্ম ও ঈশ্বররূপে পূজিত। রামের এই স্বরূপ অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণেও লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের কাহিনী ধারায় রামের ঈশ্বরত্বে পরিণতি হওয়ায় ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন বলেছেন— ''চৈতন্যের আবির্ভাবের আগে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবদীক্ষা দুই রকমের ছিল — বেশির ভাগ কৃষ্ণ মন্ত্রে আর অল্প ভাগ রাম মন্ত্রে। রাম মন্ত্রের দীক্ষা উত্তরপূর্ব বঙ্গে আসাম পর্যন্ত বেশি প্রচলিত ছিল।''[৩৮] পরবর্তীকালে এর প্রভাব লক্ষ্য করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন মহাশয় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সম্বন্ধে বলেছেন — ''গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ছাপ যথেষ্টই আছে।''[৩৯] সমকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে কবি চরিত্রের এবং কাহিনীর মোড় ঘোরাতে কাজে লাগিয়েছেন। স্বভাবতই মেনকা শিবের মোহনীয় রূপ দেখে আনন্দিত হয়। হিন্দু মতে কলাগাছ স্থাপন করে তার মাঝে সুবর্ণ ঘট রেখে পূর্বমুখে পুরোহিত বসে বিবাহের কার্য শুরু হয়। সেখানে শিব দুর্গাকে নিয়ে সাতবার বিবাহ মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে। শিব-দুর্গার গলায় পিতা হিমালয়ের পুষ্পমালা প্রদান অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং স্বতন্ত্রও বটে। পুরোহিত শিবের পূর্বপুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করলে সে ব্রহ্মার দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করে। কারণ সে অনাদি পুরুষ এবং সমুদ্রমন্থনের গরল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিল। মহাভারতে শিবের এই পরিচয়ের সঙ্গে লোকসমাজে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিকে কবি কাহিনীতে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, বিবাহের দান স্বরূপ দুই দাসীসহ সিংহ বাহন প্রদান উচ্চশ্রেণীর দুর্গা চরিত্রের অনুগামী।

''উচ্চারিঞা নাম গোত্র কন্যা দান কৈল।
দুই দাসী সিংহ বাহন দুর্গাকে দিল।।''[৪০]

শিব-দুর্গার বিবাহ কবির কথায় আদ্যগীত। এই আদ্যগীত যে জপ করবে সে যমের ভয় বা মৃত্যুকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারবে। কবির কথায় —

''শিব দুর্গার নাম জেবা জপে হৃদয়তে।

শমনের ভয় সেই তরিবে হেলাতে।।
আদ্যগীত শিবের বিভা এই আদ্যবাণী।
গাইল মানিক দত্ত ভাবিঞা ভবানী।।”[৪১]

কবি মানিক দত্ত লোকসমাজের সম্মুখে তাদের জীবন তরীর পথ নির্দেশ করে দিচ্ছেন। ব্রতকথার লোক প্রয়োজনীয়তাকেই কবি কাহিনীর মধ্যে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়— “... মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর উপর মেয়েলী ব্রতকথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছু কিছু কার্যকর হইয়াছে। ... মঙ্গলকাব্যের মূল দেবচরিত্রের মৌলিক উপাদান বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উভয়দিকেই উদ্দিষ্ট দেবতা ভক্তের রক্ষক এবং অভক্তের সংহারক এবং উভয়ক্ষেত্রেই দেবতাদের মর্ত্যলোকে নিজস্ব পূজা প্রচারই লক্ষ্য।”[৪২] এই ব্রতকথার দ্বারা গ্রথিত কাহিনী ক্ষণে ক্ষণে শিথিল প্রাপ্ত হয়েছে।

তারপর কবি কাহিনীর কার্যকারণ সূত্রানুযায়ী কালানুক্রমিক গ্রন্থনার পিনদ্ধ রক্ষা করতে পারেন নি। প্রধান কাহিনী মূল স্রোত থেকে পাশ ফিরে আবার মিলিত হয়েছে। কবি মানিক দত্ত শিব-দুর্গার বিবাহের ব্রতকথা লোক সমাজে শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করার পর হঠাৎ কাহিনী দুর্গার দেহের ময়লায় তৈরী গণেশের জন্মের প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছে। বিবাহের পর গণেশের জন্ম কথার বিষয় বিশ্বাসযোগ্য। এরূপ গৌরীর বাল্য বয়সে শিব পূজার মধ্যে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত ছিল। কিন্তু কোথায় যেন কাহিনীর ক্রম অগ্রগতিতে একটু অসঙ্গতি ঠেকে। মাঝে তাদের দাম্পত্য জীবনের কথা বললে হয়তো কাহিনী গ্রন্থনায় সন্তান লাভের ঘটনাটি অনিবার্য মনে হত। যাইহোক, গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত বলার ভঙ্গী লোকগল্প বলার মতো এবং কল্পনাপ্রসূত। দুর্গা তার অঙ্গের মল দিয়ে একটি পুতুল নির্মাণ করলে শিব তাতে জীবন দান করে।

“একদিন দুর্গা অঙ্গের মলি উঠাইল।
মলির পুতুলি এক নির্ম্মান করিল।।
মলির পুতুলি শিব জীব দান দিল।
গণেশ পুত্র বলিঞা তাহার নাম থুল্য।।”[৪৩]

গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত কাহিনী অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ বটে। এই বর্ণনার সঙ্গে বামন পুরাণের গণেশ জন্মের মিল রয়েছে। পুরাণের দেবদেবী সম্পর্কে গবেষক শম্ভুনাথ কুণ্ডু যথার্থই বলেছেন — “গণেশের জন্মবৃত্তান্ত কল্পনানির্ভর এবং সেই সঙ্গে কৌতুকপ্রদও বটে। বরাহপুরাণে (২৩ অ.) রুদ্রশিবের দেহজাত গণেশ রুদ্রেরই প্রতিমূর্ত্তিরূপে কল্পিত। ... কালক্রমে গণপতি রুদ্র-শিব থেকে পৃথক দেবসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। শিব পুরাণের জ্ঞানসংহিতায় (৩২ অ.)

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে (৩২ অ.) পার্বতী পঙ্ক দ্বারা গণেশমূর্ত্তি নির্মাণ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। বামনপুরাণে (৫৪ অ.) দেবীর গাত্রমল থেকে তাঁর জন্ম। মৎস্যপুরাণে (১৫৪ অ.) উমা গাত্রমার্জনচূর্ণ দিয়ে গজাননকে সৃষ্টি করেন। বৃহদ্ধর্ম (মধ্যখণ্ড ৩০ অ.) ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণেশখণ্ডে (৯ অ.) পুরাণকার গণেশজন্মকে কেন্দ্র করে বিচিত্র কাহিনীর অবতারণা করেছেন। গণেশের গজমুণ্ড নিয়েও পুরাণকারদের অনুরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে রুদ্ররূপী গণপতি অপেক্ষা রুদ্রপুত্র গণেশই সমধিক প্রসিদ্ধ।''[৪৪] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গণেশের জন্ম বৃত্তান্তের মিল রয়েছে বামনপুরাণের সঙ্গে। এই জন্মবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে নতুন ঘটনার সমাবেশ। সেটি হল শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডুচ্ছেদ। শিবের কথায় চণ্ড উত্তর মুখে শুয়ে থাকা ইন্দ্রের হস্তির মুণ্ডু কেটে গণেশের মাথায় স্থাপন করল এবং মন্ত্র জপ করে শিব মুণ্ডু জোড়া দিল। কবির কথায় —

> ''শিব ঠাকুর বলে চণ্ড শুন মোর কথা।/উত্তর মুণ্ডে যেবা থাকে য়ান তার মাথা।।
> উত্তর মুণ্ডে শুএ্যা ইন্দ্রের হস্তি ছিল।/ হস্তির মুণ্ড কাটি চণ্ড শিবকে য়ানি দিল।
> মন্ত্র জপি শিব ঠাকুর মুণ্ড জোড়া দিল।/ শুণ্ড মুণ্ডে গণপতি উঠিয়া বসিল।।''[৪৫]

এই বর্ণনার সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ'-এর আদি খণ্ডের কিছু অংশের সাদৃশ্য রয়েছে। সেই অংশটুকু তুলে ধরা হল —

> ''দেবগণ বলেন শুনহ বিশ্বমাতা।
> শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা।।
> *   *   *
> আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরে।
> মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তর শিয়রে।।
> গঙ্গানীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত।
> উত্তর শিয়রে শুয়েছিল নিদ্রাগত।।
> কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন।
> রক্তমাংসে জীয়াইল হৈল গজানন।।''[৪৬]

উভয় স্থানে গণেশের নাম গণপতি পাওয়া যায়। পুরাণে রুদ্রের নাম ছিল গণপতি। কিন্তু পরবর্তী কালে রুদ্রের গুণাবলী তার পুত্র গণেশের মধ্যে বর্ষিত হওয়ায় তাকে গণপতি বলা হয়। প্রসঙ্গত, পুরাণের দেবদেবী সম্বন্ধে গবেষক শম্ভুনাথ কুণ্ডু বলেছেন — ''প্রাথমিক পর্বে রুদ্রই গণপতি, গণাধিপ রূপে পরিচিত হলেও পরবর্তীকালে রুদ্রপুত্রে উক্ত গুণকর্ম আরোপিত হতে দেখা যায়। গণের পতিরূপেই তিনি গণপতি।''[৪৭] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে গণেশের জন্ম

বৃত্তান্তে পুরাণ ভাবনার সঙ্গে লৌকিক ভাবনারও সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে হয়। সেই লৌকিক ভাবনা হল গণেশের মুষিক বাহন। Alige Getty বলেছেন — "... his elephant-head and his mouth, the rat, indicate that, although he may have been taken over from indigenous mythology, he belonged originally to an animal cult."[৪৮] এই সকল পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবনার সঙ্গে গণেশের মুখে সমকালীন রাম গুণগানকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন কবি। তাই মনে হয় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গণেশের জন্ম কথা একই সঙ্গে পৌরাণিক লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সমকাল রামকথা সচেতন মিশ্র সংস্কৃতির পরিচায়ক। গণেশ জন্ম-বৃত্তান্ত কাহিনীর মধ্যে আলাদা একটি প্লটের বীজ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়, যা অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

গণেশ জন্মের পর কার্তিকের জন্মরহস্য সম্পর্কে কবি অত্যন্ত অলৌকিক বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কার্তিক চরিত্রের কোন ভূমিকা নেই। মূল কাহিনীর সূত্র ধরে কেবল রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। শিব-গৌরীর পুত্র কার্তিকের জন্মের কারণ বলা হয়েছে অত্যাচারী তারকাসুরকে নিধন করার জন্য। এই প্রসঙ্গে শম্ভুনাথ কুণ্ডু বলেছেন — ''বিভিন্ন পুরাণে কার্ত্তিকের বিচিত্র জন্ম-বৃত্তান্তের পরিচয় বিবৃত হয়েছে। উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে দৈত্যহস্তে দেবগণ বিপর্যস্ত স্বর্গচ্যুত। তারকাসুরের অত্যাচার থেকে দেবগণ তথা ত্রিভুবনকে রক্ষা করার জন্যই শিব ও পার্বতীর পুত্ররূপে তাঁর মহাবির্ভাব।''[৪৯] মানিক দত্ত চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের কাহিনী বলতে গিয়ে কার্তিকের জন্মের একটু ছোট কাহিনী মাঝখান থেকে বলে দিয়েছেন। তার বর্ণনা কৌশল পাঁচালী ঢঙ্গের। কবি বলেছেন এইভাবে —

''শুন ২ সর্ব্বজন কার্ত্তিকের বিবরণ
জে রূপে কার্ত্তিক জন্মিল।''[৫০]

সেই জন্মরহস্যের ঘটনা কৌতূহলোদ্দীপক। ঘটনাটি হল শিব রতিরঙ্গের সময় তার বীর্যপাত হলে তা দুর্গা তার উদরে ধারণ করে। সেই বীর্য এতটাই ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড যে তিন-চার মাসের বেশি ধারণ করতে অক্ষম হলে তা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অগ্নিও সেই বীর্য গঙ্গাতে ফেলে দেয়। এরূপ গুণসিন্ধু বীর্য তিন মাসের বেশি ধারণ করতে অক্ষম হলে তা বনে রাখা হয়। সেখানে ছয় মাথা যুক্ত কার্তিকের জন্ম হয়। সে বলবান ও তার বাহন ময়ূর। তারকাসুরের নিধনকারী হিসেবে কার্তিককে জন্মের উৎস থেকেই শক্তিশালীরূপে দেখানো হয়েছে। এই বর্ণনা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম। মহাভারতে কার্তিকের জন্মের কথা বলা হয়েছে এইভাবে —

''ষট্‌কৃত্বস্তত্র নিক্ষিপ্তমগ্নে রেতঃ কুরূত্তম্!।
তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা।। ১৫।।

তৎ স্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্।
ঋষিভিঃ পূজিতং স্কন্নমনয়ৎ স্কন্দতাং ততঃ।। ১৬।।
ষট্‌শিরা দ্বিগুণশ্রোত্রো দ্বিনাসাক্ষিভুজক্রমঃ।
একগ্রীবৈকজঠরঃ কুমারঃ সমপদ্যত।। ১৭।।"[৫১]

(অর্থাৎ, "কুরুশ্রেষ্ঠ! কামুকী স্বাহাদেবী প্রতিপৎ তিথিতে সেই স্বর্ণকুণ্ডে ছয় বার অগ্নিদেবের শুক্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।। ১৫।। সেই শুক্র তেজে আবৃত ছিল, তাই ঋষিরা তাহার আদর করিয়াছিলেন; ক্রমে সেই শুক্র একটী পুত্ররূপে পরিণত হল; স্কন্দ — অর্থাৎ স্থলিত শুক্র হইতে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল স্কন্দ।। ১৬।। সেই বালকটীর ছয়টী মাথা, বারখানি কাণ, ছয়টী নাখ, বারটী চোখ, বারখানি হাত, একটী গ্রীবা এবং একটী উদর হইয়াছিল।। ১৭।।"[৫১]) কিন্তু স্কন্দপুরাণে কার্তিকের জন্মের কথা বলা হয়েছে একটু অন্যভাবে। সেখানে শিবের বীর্য অগ্নি ধারণ করে। কিন্তু সে তা সহ্য করতে পারে না। বনের ঋষিগণের পত্নীরা শীতকালে অগ্নি তাপ নিতে গেলে সেই বীর্য তাদের দেহে সঞ্চারিত হয়। তারফলে ঋষিগণ তাদের অভিশাপ দেয় এবং তারা আকাশের নক্ষত্রে পরিণত হয়। তখন তারা —

"তদানীমেব তাঃ সর্ব্বা ব্যাভিচারেণ দুঃখিতাঃ।
তৎ সসর্জ্জুস্তদা রেতঃ পৃষ্ঠে হিমবতো গিরেঃ।। ৭৬
ঐকপদ্যেন তদ্রেতস্তপ্তচামীকরপ্রভম্।
গঙ্গায়াঞ্চ তদা ক্ষিপ্তং কীচকৈঃ পরিবেষ্টিতম্।। ৭৭
ষন্মুখং বালকং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে দেবা মুদান্বিতা।"[৫২]

(অর্থাৎ, "ব্যভিচার-দোষে কৃত্তিকাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তৎকালে হিমগিরির পৃষ্ঠে সেই রেতঃ বিসর্জ্জন করিলেন। ক্রমে সকলের রেতঃ একীভূত হইয়া তপ্ত চামীকরাকর ধারণ করিল এবং ঘটনাক্রমে সত্বরই তাহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া কীচকসমূহে পরিবেষ্টিত হইল। দেবগণ তখন সেই রেতঃকে ষন্মুখ বালকরূপে অবগত হইয়া মুদান্বিত হইলেন।"[৫২]) আবার, কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের দশম সর্গ-এ বলা হয়েছে —

"কৃশানুরেতসো রেতস্তাসামভি কালেবরম্।/ অমোঘং সঞ্চচারাথ সদ্যো গঙ্গাবগাহনাৎ।।৫৪।।
রৌদ্রং সুদুর্দ্ধরং ধাম দধানা দহনাত্মকম্।/ পরিতাপমবাপুস্তা মগ্না ইব বিষাম্বুধৌ।।৫৫।।
অক্ষমা দুর্বহং বোঢুমদৃশ্বুনো বহিবাতুরাঃ।/ অগ্নিং জ্বলন্তমন্তস্তা দধানা ইব নির্যযুঃ।।৫৬।।
অমোঘং শাম্ভবং বীজং সদ্যো নদ্যোঙ্কিতং মহৎ।/ তামামভ্যুদরং দীপং স্থিতং গর্ভত্বমাগমৎ।।৫৭।।
সুজ্ঞা বিজ্ঞায় তা গর্ভভূতং তদবোঢ়মক্ষমাঃ।/ বিষাদমাদধুঃ সদ্যো গাঢ়ং ভর্ত্তৃভিয়া হ্রিয়া।।৫৮।।
ততঃ শরবণে সার্দ্ধং ভয়েন ব্রীড়য়া চ তাঃ।/ তদগর্ভজাতমুৎসৃজ্য স্বান্ গৃহানভিনির্যযুঃ।।৫৯।।

তাভিস্তত্রামৃতকরকলাকোমলং ভাসমানং তদ্বিক্ষিপ্তং ক্ষণমভি নভো গর্ভমভ্যুজ্জিহানৈঃ।

স্বৈস্তেজোভির্দিনকরশতস্পর্দ্ধমানৈরমানৈর্বক্তৈঃ ষড়্ভিঃ স্মরহরগুরুস্পর্দ্ধয়েবাজনীব।।৬০।।"[৫৩]

(অর্থাৎ, "অনন্তর গঙ্গাজলে অবগাহন হেতু মহাদেবের সেই অমোঘ রেতঃ ষট্‌কৃত্তিকার শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চারিত হইল।। ৫৪।। তাঁহার সেই দুৰ্দ্ধর দহনাত্মক রুদ্রতেজ ধারণ করিয়া বিষসমুদ্রে নিমগ্নের ন্যায় (দুঃসহ) সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন।। ৫৫।। তাঁহার সেই দুর্ব্বহ তেজঃ বহনে অসমর্থ ও আতুর হইয়া যেন জ্বলন্ত অগ্নি অন্তরে ধারণপূর্ব্বক জল হইতে বহির্গত হইলেন।। ৫৬।। গঙ্গা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই তীব্র অমোঘ শৈববীজ তাঁহাদের উদর মধ্যে সংস্থিত হইয়া গর্ভত্ব প্রাপ্ত হইলো।। ৫৭।। সম্যক্ জ্ঞানবতী কৃত্তিকারা সেই তেজঃ গর্ভে পরিণত হইয়াছে জানিয়া ও তাহা বহনে অসমর্থ হইয়া স্বামীর ভয়ে ও লজ্জায় অত্যন্ত বিষন্নভাব প্রাপ্ত হইলেন।। ৫৮।। তদন্তর সেই ষটকৃত্তিকা ভয় ও লজ্জার সহিত শরবনে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।। ৫৯।। তাঁহারা সেই শরবনে শশিকলার ন্যায় কোমল সেই গর্ভ ক্ষণকাল মধ্যে আকাশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে, শত শত সূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী সেই অপরিমেয় তেজঃ স্মরহরগুরু ব্রহ্মার মস্তকের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন ছয়টি মুখ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।। ৬০।।"[৫৩]) এখানে যেসকল পুরাণে কার্তিকের জন্মের রহস্যময় কাহিনী রয়েছে তার সঙ্গে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কার্তিকের জন্মের কাহিনীর কিছু কিছু মিল রয়েছে। কবি মানিক দত্ত হুবহু পুরাণ থেকে এই অংশটিকে কাহিনীর মধ্যে গ্রহণ করেন নি। তিনি পুরাণের ভাবনার সঙ্গে চণ্ডীর গর্ভে শিবের বীর্যকে ধারণ করার কথা সংযুক্ত করেছেন। তিনি কার্তিকের এই জন্ম রহস্যকে শিব ও দুর্গা অবলম্বনে রচিত মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে একটা আলাদা উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছেন।

এই কাহিনীর পর মানিক দত্ত দেবী চণ্ডীকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার সম্বন্ধে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছেন। তার ফলে কাহিনী গ্রন্থনায় কার্যকারণ সূত্র ও অনিবার্যতার গুণ হারিয়েছে। সেখানে দেবী চণ্ডীকে তিনি কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী নিয়ে দুর্গাকে মাতৃরূপেই চিহ্নিত করেছেন। কবির কথায় —

"নম নম নম মাতা নম নারায়নি।
তুমার চরণ বন্দ লুটাঞা ধরনী।।
অপার মহিমা তুমার বলিতে না জানি।
সৃষ্টি রক্ষিনী মাতা আদ্যা ভবানী।।
*　　　*　　　*
গণেশ লইঞা কোলে পঞ্চ দেবতা।

নাএকের কামনা সিদ্ধ কর দুর্গামাতা।''[৫৪]

এই বর্ণনার সঙ্গে কাব্যের মূল অভিপ্রায়ের কোন যোগ নেই। সন্তান বৎসল দেবীর প্রতি ভক্তের আত্মিক স্তুতি বাক্যই প্রধান হয়ে উঠেছে।

তারপর তিনি যে উপকাহিনীটি তুলে ধরেছেন সেখানেও চণ্ডীর মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে। সেই উপকাহিনীটি হল পুরাণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মধুকৈটভ অসুরদ্বয়ের জন্মের ঘটনা। এই ঘটনায় অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ স্বরূপ চণ্ডীর আবির্ভাব। মধুকৈটভ অসুরদ্বয়ের জন্ম ও তাদের থেকে বহু অসুরের জন্মের কথা তিনি গল্পের মত করে বলেছেন।

''একদিন বিষ্ণু কর্ণতে হস্ত দিল।
কর্ণমূলে মধুকৈটভ অসুর জন্মিল।।
জন্মিতে ২ অনেক অসুর হৈল।
লেখা জোখা নাই অসুরময় হৈল।।
সকল অসুর হৈল বড়ই প্রচণ্ড।''[৫৫]

এই মধুকৈটভের জন্মের ঘটনার সঙ্গে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণম্' গ্রন্থে বর্ণিত তাদের জন্ম কথার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বন করলে —

''তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।। ৫০''[৫৬]

(অর্থাৎ, ''তখন বিষ্ণু-কর্ণমলসম্ভূত, মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।''[৫৬]) 'দেবী-ভাগবত'-এ মধুকৈটভ জন্মের কথা প্রায় অনুরূপ পাওয়া যায়। '' ... মহাবলশালী মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয় ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগর জলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিল।''[৫৭] এদের ভয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকুণ্ডে লুকিয়ে পড়ে। বিষ্ণু অসুরের দৌরাত্ম্য শুনে ক্রোধান্বিত হয়। তাদের সঙ্গে বিষ্ণুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধ 'ষাটি সহস্র' বছর চলতে থাকে। এই উভয়পক্ষের মল্ল যুদ্ধের বর্ণনা আমরা 'দেবী-ভাগবত' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে পাই। মল্ল যুদ্ধে অপরাজেয় হয়ে অসুরদ্বয় বিষ্ণুকে তাদের জলের উপর নিধন করতে বলে। তাই বিষ্ণু মধুকৈটভ অসুরদ্বয়কে উরুর উপর রেখে বধ করল। কিন্তু সেই অসুরের রক্তে আরো অসুরের জন্ম হতে থাকে।

''রণতে অসুর জদি মরে একজন।
এক অসুরের রক্তে জন্মে কতজন।।''[৫৮]

বিষ্ণু নিরূপায় হয়ে দেবী দুর্গার শরণাপন্ন হল। দশভুজা দুর্গাকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন শিব ত্রিশূল,

বরুণ নাগপাশ, যম যমদণ্ড প্রদান করল। এই বর্ণনার সঙ্গে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণম্' গ্রন্থে দেবীর প্রাপ্ত অস্ত্রের মিল রয়েছে।

''শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।

*   *   *

কালদণ্ডাদ্‌যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।''[৫৯]

(অর্থাৎ, ''অনন্তর মহাদেব স্বকীয় শূল হইতে শূল আকর্ষণ করিয়া সেই দেবীকে প্রদান করিলেন। ... যম কালদণ্ড হইতে দণ্ড উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। বরুণ তাঁহাকে পাশ প্রদান করিলেন।''[৫৯]) ক্রোধান্বিত চণ্ডী অসুরদের একে একে সংহার করতে লাগল। সেই যুদ্ধে মহাবীজ ও রক্তবীজ নামে দুই অসুর রথ থেকে মাটিতে পড়ে গেলে দেবী চণ্ডী তাদের মাথা কেটে নেয়। তারপর চণ্ডী ক্রোধিত হয়ে সারথি সহ মহীধর নামে অসুরকে গলার্ধকরণ করে। কবি বলেছেন —

''ক্রোধিত হঞা দুর্গা মাতা মুখ মেলিল।

সারথি সহিতে তাকে গিলিঞা ফেলিল।।''[৬০]

এর সঙ্গে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণম্' গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে —

''পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি - যোধঘন্টাসমন্বিতান।

সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্।। ৯।।

তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।

নিক্ষিপ্য বক্তে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্।। ১০।।''[৬১]

(অর্থাৎ , ''দেবী — পশ্চাদ্রক্ষক, অঙ্কুশগ্রাহী যোদ্ধা ও ঘন্টার সহিত হস্তিসমূহকে এক হাতে গ্রহণ করিয়া মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত যোদ্ধাগণকে গ্রহণপূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ করিয়া অতিভয়ঙ্কররূপে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।''[৬১]) দেবী চণ্ডী যত অসুরদের মুণ্ডু কাটতে লাগল ততই অসুরের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এই অবস্থায় চণ্ডী খাপর পেতে রক্ত পান করে থাকে, তাদের ছেদন মুণ্ডুর মালা গলায় পরিধান করে।

''অসুরের মুণ্ড কত রণতে কাটিল।/ জত কাটে তত অসুর বাড়িতে লাগিল।।

দেবগণ আসিঞা দুর্গাকে যুক্তি দিল।/ রণস্থল যুড়ি দুর্গা খাপর পাতিল।।

জোগিনী সঙ্গে যুক্তি করি যুঝিছে ভবানী।/ দুর্গা পদভরে তথা কাপিছে ধরনী।।

অসুরকে কাটে দুর্গা খাপর উপরে।/ খাপর ভরিঞা রক্ত দুর্গা পান করে।।

প্রচণ্ড হইঞা দুর্গা ঘোর রণ করে।/ অসুরের মুণ্ড কাটি মুণ্ডমালা পড়ে।।''[৬২]

আমরা 'মার্কণ্ডেয়পুরাণম্'-নেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাই। সেখানে বলা হয়েছে —

''পলায়নপরান্ দৃষ্টা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।

যোদ্ধুমভ্যায়যৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ।। ৩৯

রক্তবিন্দুর্যদা ভুমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।

সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ।। ৪০

*   *   *

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শবীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।

তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যব বিক্রমাঃ।। ৪৩

*   *   *

ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।

মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্।। ৫৬''[৬৩]

(অর্থাৎ, ''মাতৃগণ-পীড়িত দৈত্যগণ পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রক্তবীজ নামে মহাসুর ক্রোধে যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। এই রক্তবীজাসুরের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্ত যখন মাটিতে পতিত হয়, তখনই ভূমি হইতে তদ্‌নরূপ একটি অসুর উৎপন্ন হয়। ... তাহার শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইল, তত পুরুষই উৎপন্ন হইল। .... এ দিকে সেই আহত অসুরের শরীর হইতে যে সকল শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল, চামুণ্ডা সেই সকল শণিত মুখ দ্বারা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।''[৬৩]) মুণ্ডমালা পরিধান করে চণ্ডী শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের সঙ্গে পরাক্রম যুদ্ধে মত্ত হয়। সেই যুদ্ধে দেবী চণ্ডী ঘর্ম নিঃসৃত হয় এবং সেই ঘাম থেকে কালীর জন্ম হয়। কালী চামুণ্ডা হয়ে যুদ্ধে নামে এবং শুম্ভ-নিশুম্ভকে কেটে তার মাংস ভক্ষণ করে। কালীই আবার দুর্গারূপে রথ ও তার সারথিকে গলার্ধকরণ করে। লক্ষণীয়, আদ্যা এই কাব্যের কাহিনীতে দুর্গাতে, দুর্গা ভয়ঙ্করী কালীতে পরিণত হয়েছে। তার ভয়ঙ্কর সংহার রূপে পৃথিবী টলমল করে কাঁপতে থাকে। সেই বর্ণনা এইরূপ —

''রণ করে দুর্গা মাতা অতি যে গম্ভীর।/ রণ করিতে দুর্গার ঘামিল শরীর।।

ঘাম মুছিয়া দুর্গা ভূমিতে ফেলিল।/ দুর্গার ঘামেতে কালী তখন জন্মিল।।

চামুণ্ডা হঞা কালী রণতে নাম্ভিল।/ শুম্ভ নিশুম্ভকে কাটি তার মাংস খাল্য।।

মুণ্ড মালা পহ্রিয়া হইল বিপরীত।/ রথারথি গিলে দুর্গা সারথি সহিত।।

দিগম্বরী বেশে হঞা যুধ্য করিল।/ অসুর গণকে কালী সংহার করিল।।

রক্তে নদী ভাসি জায় হাসে খলখল।/ পদভরে পৃথিবী কাপিছে টলমল।।''[৬৪]

'দেবী-ভাগবত' গ্রন্থের ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ের (পৃ. ৩১০-১৬) চামুণ্ডার ও কালীর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ও শণিত পান, মুণ্ডমালা পরিধানের কথা পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮৯ ও ৯০ অধ্যায়ে দেবী চণ্ডীর শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের নিধনের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে কালী দুর্গার দেহ থেকে জন্ম এবং একথা দেবী-ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু 'পৌরাণিক অভিধান'-

এর সংকলক সুধীরচন্দ্র সরকার বলেছেন — "শক্তি-উপাসকরা কালীকে আদ্যাশক্তি বলে উপাসনা করেন। ... বিশেষতঃ শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে, দেবতারা পরাজিত হয়ে স্বর্গ হতে বিতাড়িত হন ও দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করতে থাকেন। তখন দেবীর শরীর-কোষ হতে অপর এক দেবী আবির্ভূতা হন। সেই দেবী কৌষিকী নামে খ্যাত। দেবী কৌষিকী শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হলে, ভগবতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন এবং সেই থেকে ইনি কালিকা বা কালী নামে পরিচিতা। ... দেবী কালী (পার্বতী) ও চণ্ডিকা (কৌশিকা) শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।"[৬৫] মানিক দত্ত শুম্ভ-নিশুম্ভের নিধনের কাহিনীতে পুরাণকে এবং তন্ত্রের শক্তিদেবীর উপর বেশি জোর দিয়েছেন বলে মনে হয়।

দেবীর সংহার রূপ প্রকাশেও তন্ত্রের প্রভাব রয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনায় মূল কাহিনীর সঙ্গে এর অল্প সম্পর্ক থাকলেও দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই এখানে মুখ্য। তাই দেবীর সংহার রূপকে শান্ত করতে এবং সৃষ্টি রক্ষার জন্য শিব উলঙ্গ হয়ে রণস্থলে শুয়ে পড়ে। কালী শিবকে অসুর ভেবে তার বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে শিবকে দেখে লজ্জায় জিহ্বা দাঁতে চাপা দেয় এবং দেবী শান্ত হয়।

"সৃষ্টি রক্ষার তরে শিব রণতে আইল।
উলঙ্গ হইয়া শিব রণতে শুইল।।
হুহুঙ্কার ছাড়ি ক্রোধে দিঞা করতালি।
অসুর বুলিঞা শিবের বুকে চড়িলেন কালী।।
পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।
দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।"[৬৬]

এখানে কবি মানিক দত্ত কার্তিকের জন্মের কথা বলার পর চণ্ডীর স্তব করেই কাহিনীকে পুরাণ বিষয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছেন। তার ফলে দেবী চণ্ডীর কাহিনীর মধ্যে পুরাণে দেবী চণ্ডীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছোট উপকাহিনী ও ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। প্রধান কাহিনীর সঙ্গে এর সংযোগ স্বল্প। প্রধান কাহিনী ও তার প্রধান দেবী চরিত্রকে পাঠক সমাজে আকর্ষণীয় করে তুলতে গিয়ে মূল কাহিনী হয়েছে বিলম্বিত। তাতে মূল কাহিনী মঙ্গলকাব্যের কাঠামো থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তাই এই অংশে কাহিনী গ্রন্থনার দৃঢ়তা বজায় থাকেনি বলে বোধ হয়।

অতঃপর কাহিনী মূল ধারায় ক্ষণকালের জন্য প্রবাহিত হয়। দেবী চণ্ডী নিজে পূজা প্রচারের জন্য নারদকে নিয়ে ইন্দ্র সভায় উপস্থিত হয়। ইন্দ্রের কাছে পুত্রদ্বয় পালনের জন্য সে পঞ্চদাসী প্রার্থনা করে। ইন্দ্র হারা, তারা, সত্যা, কমলা ও পদ্যা নামে পঞ্চদাসী তাকে প্রদান করে। এই পঞ্চদাসীকে দেখে কামাতুর শিব উন্মত্ত হয়। দেবী চণ্ডী তখন দাস-দাসীদের সঙ্গে শিবের কাম

প্রবৃত্তি নিবারণের ইচ্ছাকে দেবসমাজের ভয় দেখায়। একথায় শিব ভীত না হয়ে চণ্ডীকে নীতিবাক্য বলেছে —

"শিব বোলে শুন দুর্গা কহি আমি বানী।
জে জন পালন করে সে জন জননী।।"[৬৭]

কবি এই নীতি বাক্যকে চণ্ডীর মত মাতার পরাজয়ের অস্ত্র স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তাই চণ্ডী শিবের সম্মুখে দাসীকে উপস্থিত করতে বাধ্য হয়। কাহিনীতে নারীর অসহায় অবস্থাকে কেন্দ্র করেই চণ্ডীর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেরিয়ে পড়ার ঘটনা বর্ণিত হয়। এই ঘটনায় কয়েকটি নারী চরিত্রের অনুপ্রবেশ কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। তাদের সামাজিক পরিচয় সারথি ও জ্যোতিষী। তাদের মধ্যে ছিল সারথি ইমলা ও বিমলা এবং জ্যোতিষী পদ্মাবতী। এই পূজা প্রচারের ঘটনাকে সামনে রেখে অপর একটি মার্কণ্ডেয়পুরাণের ঘটনা এসেছে। সেটি এখানে দান্দ্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তার সূচনা পদ্মাবতীর কাছে দেবীর আগমনের মধ্য দিয়ে। পদ্মাবতী তাকে মর্ত্যে পদ্মার পূজা প্রচলনের ঘটনা বলে। সে ধূম্রলোচন নামক অসুরের সেবা করায় মর্ত্যে তার পূজা প্রচলন হয়। একথা শুনে দেবী চণ্ডী অতিষ্ঠ হয়ে ধূম্রাসুর বধের কথা তাকে বলে। সকল দেবতা ধূম্রাসুরের সেবা করলেও প্রবল পরাক্রমশালিনী দেবী চণ্ডী তাকে বধ করেই মর্ত্যে পূজা প্রচারের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। দেবী চণ্ডীর কথায় —

"ক্রোধে বলে নারায়নি শুন বাছা নারদ মুনি
জদি অসুর মারিবারে পারি।
দেবের ঘুচাব ভয় আনন্দ হৃদয়
গুপ্তকথা তোমাকে কোএগাদি।।"[৬৮]

এই পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী সমকালীন মানুষেরপুথির প্রতি বিশ্বাসের দিকটি বড় করে তুলে ধরা হয়েছে।

"পুঁথি মেলিল পদ্মা উচ্চারিল
ধূম্র ভয়ে মর্থপুরে না আইযে দেবতা।।"[৬৯]

তাই চণ্ডী মর্ত্যে ধূম্রাসুরকে বধ করতে যায়। তাতে নারীর অসুর বিরোধিতা দেখে তাদের প্রমাদ মনে হয়েছে। এই প্রমাদের আড়ালে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরায়ত সংস্কার। তবে যুদ্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে অশ্লীল গালাগালি অস্বাভাবিক ও লৌকিক গ্রাম্য বলে মনে হয়। ভয়ঙ্কর লড়াই দেখে নারদ ভয়ে রণস্থল থেকে পালিয়ে শিবের কাছে চণ্ডীর আসন্ন বিপদের কথা বর্ণনা পরবর্তী ঘটনার পরিপূরক। শিব তখন বৃষের উপর বসে শিঙ্গা, ডমরু, চক্র ও বাণ নিয়ে রণস্থলে উপস্থিত হয়। শিবের শিঙ্গা, ডমরুর সঙ্গে বিষ্ণুর চক্র ও বাণ ধারণ করা তার চরিত্রের

পক্ষে অনুপযুক্ত মনে হয়। শিবের আজ্ঞায় চণ্ডী বাণ দিয়ে ধূম্রাসুরের মাথা কাটে। কবির কথায় —

“শিবের আজ্ঞাএ দুর্গা হস্তে বাণ নিল।

অস্ত্রে মাথা কাটিয়া বুকে শেল দিল।।”[৭০]

‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’-এও দেবী চণ্ডীর ধূম্রাসুর বধের কথা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে —

“ইত্যুক্তঃ সোহভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ

হূঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ।।”[৭১]

(অর্থাৎ, “দেবী এই কথা বলিবা মাত্র সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা হূঙ্কার দ্বারা সেই অসুরকে ভস্মীভূত করিলেন।”[৭১]) দেখা যাচ্ছে যে মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী ধূম্রালোচনকে হূঙ্কারের দ্বারা ভস্মীভূত করে। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেখানে দেবী চণ্ডী বাণ দ্বারা তাকে নিধন করে। মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য কারণ হিসাবে এসেছে ধূম্রাসুরের বধের ঘটনা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিবের পত্নীপরায়ণতার দিকটি। কবি এখানে ঘটনা পরিস্থিতি অনুসারে গ্রন্থনা করেছেন। সেই জন্য তিনি মার্কণ্ডেয়পুরাণকে তার অনুঘটক হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন।

ধূম্রলোচন নিধনে তার মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য পদ্মা তাকে কলিঙ্গে দোহরা নির্মাণ করতে বলে। কাহিনী এখান থেকে মর্ত্যভূমিতে বিচরণ করে। কলিঙ্গে দোহরা নির্মাণ করার জন্য বিশ্বকর্মাকে চণ্ডী স্মরণ করে। বিশ্বকর্মা দেবীর কাছে সহকর্মী হিসেবে শক্তিশালী হনুমানকে দিতে বলে। হনুমান যে প্রবল শক্তিশালী তার প্রমাণ এর ফাঁকে কবি দিয়েছেন। বিশ্বকর্মার সঙ্গে ভীম ও অর্জুন নামে দুই শ্রমিক এই দোহরা নির্মাণের কাজে যোগ দান করে। এদের নাম পুরাণে ক্ষমতা, পৌরুষত্ব ও বীরত্বের দিক দিয়ে অতি পরিচিত। এই সকল নাম মধ্যযুগেও প্রচলন ছিল। আর কবি এই দোহরা নির্মাণের প্রসঙ্গে এই চরিত্রগুলিকে সাধারণ মানুষের ভূমিকায় নির্বাচন করেছেন। সেই সঙ্গে কবির সমাজ বাস্তবতার পরিচয় পওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে, কবি মর্ত্যভূমির কাছে দেবী চণ্ডীর পূজার মাহাত্ম্য ও উপযোগিতা চণ্ডীর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

“পদ্মা চল জাই মহীমণ্ডলে।

রত্ন জানিয়া জে নরে সেবা করে

ধনে বংশে উদ্ধারিব তারে।।

অসমএ তরাব আর দোতরে করিব পার

রাজঘরে করিব ভালাই।

জে নর মরিয়া জায় তাকে হব বরদায়

আপন ভুবনে দিব ঠাই।।"[৭২]

সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে একথা জানিয়ে দেবী চণ্ডী কলিঙ্গরাজ সুরথকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। তার লক্ষ্য সাধারণ মানুষ, উপলক্ষ্য রাজা সুরথ। যদি রাজা তার পূজা করে তবে অকাতরে সাধারণ মানুষও তার পূজা করবে। তাই কবি প্রথমেই সাধারণ মানুষের মন আকর্ষণ করার জন্য দেবী চণ্ডী পূজার মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি রাজা সুরথকে উপলক্ষ্য করে স্বপ্নে পূজার নিয়মাবলী উপস্থাপন করেছেন। সেই পূজা পদ্ধতির সঙ্গে তন্ত্রের পূজা পদ্ধতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তন্ত্রের প্রচণ্ডা শক্তি দেবী চণ্ডীকে ছাগল, মেষ ও মহিষ বলিদানে সন্তুষ্ট করা হয়। তাকে সন্তুষ্ট করা গেলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ও অসাধ্য সাধন হয়। এই অদ্ভুতদেবীর স্বপ্ন দেখার পর প্রভাতে রাজা রাজসভায় পাত্রমিত্রদের স্বপ্নের সকল কথা বলে। তার আদেশে সকল প্রজাকে দেবী পূজার কথা বলা হয়। সকল প্রজা রাজার শক্তিদেবীকে ছাগল, মহিষ ও মেষ নিয়ে দুন্দুভি বাজিয়ে পূজা করতে যায়। তার সঙ্গে রাজবংশী লোকবাদ্য সারিন্দা ও পীণাক বাজানো হয়। সেই সঙ্গে নাটুয়া লোকনাট্য করতে করতে যায়। রাজা সুরথ স্নান করে দেহসুদ্ধি করে নেয় এবং ছাগ, মহিষ বলির সঙ্গে রক্তজবা দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে পূজা করে। তার বর্ণনা কবির ভাষায় —

"রাজা পুনুর্ব্বার করি স্নান দেহরাতে অধিষ্ঠান
নানামতে দুর্গা পূজা করে।
ছাগ মহিষ জত তাহারা বলিব কত
বিনি জবাতে পূজা করে।।"[৭৩]

ছাগল ও মহিষ বলি দিয়ে এবং রজোগুণের জবা ফুল দিয়ে পূজা করলে শক্তিদেবী চণ্ডী সন্তুষ্ট হয়। কবি সমাজের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য কাহিনীতে লোকবাদ্য, লোকনাট্য নাটুয়ার কথা এবং তন্ত্রের পূজা পদ্ধতির কথা তুলে এনেছেন বলে মনে হয়।

এরপর কাহিনী গ্রন্থনায় কবির আত্মপরিচয় উঠে এসেছে। তাকে দেবীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের সঙ্গে একই সম্পর্কের সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা না থাকলেও স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে মর্ত্যলোকে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রবল প্রচারের জন্য রাজা সুরথের পর কবি গায়েন মানিক দত্তকে নির্বাচন করেন। পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্র ভুবনে পুথি আনতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সমকালীন পুথির পবিত্র মূল্যের পরিচয় উঠে এসেছে। সেই পুথির অর্দ্ধেক ইন্দ্র, বাসুকি, গন্ধর্ব সকলে নিল মান-সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য। আর চণ্ডী তার অর্দ্ধেক নিয়ে এল এবং তার লাথি দ্বারা কানা খোঁড়া কবি সুস্থ হল। এরূপ অলৌকিক ঘটনা কবি চণ্ডীর পুথি প্রাপ্তি ও তাকে প্রদানের ক্ষেত্রে কাহিনীতে সংযোজন করেছেন। স্বাভাবিক ভাবে মানিক দত্ত তম্বুর রঘু ও বায়েন রাঘবকে নিয়ে কলিঙ্গ মাঝে দেবীর মঙ্গল গীত

করতে আসে। তা কলিঙ্গের সকল প্রজার আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাতে রাজসভায় প্রজাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে কলিঙ্গরাজ সুরথের সঙ্গে দেবীভক্ত মানিক দত্তের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে। তাঁকে রাজ সভায় ধরে আনা হয়। মানিক দত্ত দেবীর স্বপ্নের কথা বললেও সুরথ তাকে বন্দী করে। কবি এই ঘটনায় বলেন —

"বন্দি পড়িয়া দত্তে ভবানী স্মরণ করে
মা কেন গীত শিখাইলে মোরে।।"৭৪

কবিকে দেবীই মঙ্গলগীত শিখিয়েছে। সেই গীতের কারণে তার এই পরিস্থিতি। স্বভাবতই, দেবী তার ভক্তের প্রতি সহৃদয় হয়। মানিক দত্তের এরূপ অবস্থায় দেবী চণ্ডী সুরথ রাজকে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখায় এবং তাতে তার ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ বড় হয়ে উঠেছে। ভীত কলিঙ্গরাজ শেষ পর্যন্ত কবিকে অত্যন্ত মান-সম্মানের সঙ্গে ছেড়ে দেয়। এভাবে কলিঙ্গে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের পরেও কবি কাহিনীতে দেবী চণ্ডীর ঐশ্বর্যভাব প্রকটিত করার ঘটনা এসেছে। সেই ঘটনাটি হল কলিঙ্গরাজ সাক্ষাতে দেবীকে দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ। তা কাহিনী গ্রন্থনায় অতিরিক্ত মেদ অংশ বলা যায়। সুরথ চণ্ডীর উদ্দেশ্যে বলে —

"সুরথ বলে দুর্গা পূজিলাম দুইবার।
না দেখিলাম নিজ মূর্ত্তি দূরভাগ্য আমার।।
স্বপন দেখিলাম মূর্ত্তি পত্যয় না জানি।
সাক্ষাতে দেখিলে গিঞা ভাগ্য হেন মানি।।"৭৫

সেই প্রসঙ্গে দেবী চণ্ডীর দশভূজা মূর্তি ও সিংহে আরোহন রূপ এবং দশহস্তের মাহাত্ম্য ও ত্রিনয়নের কারণ কাহিনীতে উঠে এসেছে। মনে হয় কবি দেবী চণ্ডীর রূপকথা বলার আগ্রহে অধীর। জনসম্মুখে দেবীর ঐশ্বর্যভাব ও তার দশভূজার রহস্য উন্মোচন করলে সাধারণ মানুষ আকর্যণ অনুভব করবে। গায়েন কবি হিসেবে এটাই তার লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। এতে কাহিনী গ্রন্থনায় প্রধান চণ্ডী চরিত্রকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দুর্গার দশভূজের নাম ও তার কারণ এত সুন্দর ভাবে কোথাও বা কোন পুরাণে বর্ণিত হয় নি। সম্ভবত কবি শ্রোতা মনোরঞ্জনের জন্য কাহিনীতে এরূপ ভক্তিগাঢ় ও রসঘন বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন।

তবে দুর্গার এই অদ্ভুতরূপের বর্ণনায় কলিঙ্গরাজের কি প্রতিক্রিয়া তা কাহিনী গ্রন্থনায় বর্ণিত হয় নি। তারপরই চণ্ডীর পশুসৃজন বিষয়টি কাহিনীর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও অনেকটাই মুখরোচক ও লোকরঞ্জন (entertainment) করার মতো বলে মনে হয়। চণ্ডীর দশ ভুজার রহস্য উন্মোচনের পর পশু সৃজন বিষয়টির কোন কার্যকারণ সূত্র নেই। দেবী চণ্ডী পদ্মার কথায় পশুসৃজন করতে আরম্ভ করে। সেই ক্ষেত্রে পশুদের বিভিন্ন নামের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেই

পশুদের দেবী চণ্ডী আহারের ব্যবস্থা করে নি। এই পরিস্থিতিতে দেখা যায় শিব ও নারদের মর্ত্যভূমির দিকে যাত্রার ঘটনা। তাই শিব অনাহারে পশুদের দেখে চিন্তিত হয় এবং —

"শিব বোলে এমত কর্ম্ম কোন দেবে করে।
জীব সৃজন করি পালন না করে।।"[৭৬]

পশুদের অনাহারে রাখার ঘটনাকে কাহিনী গ্রন্থনায় কবি চণ্ডী ও শিবের দ্বন্দ্ব হিসেবে নির্বাচন করেছেন। লোক-চক্ষে এই অন্যায়বোধটি শিবের মধ্য দিয়ে সজাগ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিবের মত যোগীমানুষ মন্ত্রের প্রতাপে প্রথম বন সৃজন করে নি। তার বীজ সৃজনকে সামনে রেখে কাহিনীতে বলি রাজা নামক চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। বীজ সৃজনের ঘটনা কাহিনীকে বিস্তৃতি দান করেছে। শিব বীজের জন্য বলি রাজার কাছে যায়। বলি রাজা তাকে বীজ দেওয়ার পর সে বিজুবন সৃষ্টি করে। বিজুবন সৃজনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে এহেন গাছ নেই যা বর্ণিত হয়নি। কবি বিজুবনের বর্ণনায় একটি দীর্ঘ গাছের তালিকা প্রদান করেছেন। এই বর্ণনার কাহিনী গ্রন্থনার সঙ্গে কোন যোগ নেই। তবুও কবিরা পাঠকের বা শ্রোতাদের মনোসংযোগকে ভিন্ন দিকে পরিচালিত করতে এরূপ বর্ণনা করতেন। নদীকুলে ঝাউ গাছ এবং পাশে কুশি গাছের বর্ণনা সৌন্দর্যের পরিচয়বাহী। পশুদের অনাহারের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিজুবন সৃজন। বিজুবন সৃজনের ঘটনায় প্রবেশ করার জন্য কাহিনীতে কারণ স্বরূপ দেবী চণ্ডীর পশু সৃজন, অনাহারের বিষয় এবং বলি রাজার কাছে যাত্রা এবং বীজ আনয়নের ঘটনাগুলি ভীড় করেছে। সেখানে পশুদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের বর্ণনা না করে এত বিচিত্র গাছের বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমাদের সৌন্দর্যের আকর্ষণে ও চিত্তহরণের কারণ হয়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনী থেকে বনের বিচিত্র বর্ণনা অংশটুকু বাদ দিলে কাহিনী গ্রন্থনায় কোথাও কার্যকারণ সূত্র লঙ্ঘিত হবে না। কাহিনীতে এই অংশটি অতিরিক্ত বলে মনে হয়। আবার ভাঙ্গ সৃজনের ঘটনা ও তার গুণাবলীর বর্ণনাংশ মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তা সমৃদ্ধ হয়েছে। মূল কাহিনীর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে পশুখাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাঙ্গ সৃজনের কথা ও তার গুণাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। তা লোক সমাজের কাছে তথ্য প্রদান (information) ও শ্রোতার মনসংযোগ আকর্ষণের কারণ বলে ধারণা করা যেতে পারে। দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট বা প্রকৃত কাহিনী গ্রন্থনায় এরূপ ঘটনার বিস্তৃতি একান্ত অপরিহার্য নয়। তবে শিব ও চণ্ডীর দ্বন্দ্ব সৃজনের জন্য এরপর চণ্ডীর মর্ত্যে যাত্রার ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক। দেবী বিজু বনের পশুগণের আনন্দিত অবস্থা দেখে আচম্বিত হয়। তার সহচরী পদ্মা তাকে শিবের ঐ বিজুবনের সৃজনের কথা জানায়। তা শুনে চণ্ডী ক্রোধান্বিত হয়। এবং পদ্মাকে সে বলে —

"দেবী বোলে শুন পদ্মা আমার বচন।
কি মতে হইবে মোর ব্রতের সৃজন।।"[৭৭]

সুতরাং দেবীর কাছে ব্রতকথা প্রচার করা মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পশুদের দ্বারা তার পূজা ব্যর্থ হলে কাহিনীতে আসে ইন্দ্র-ছলনার ঘটনা। সেই ঘটনার সূচক হল পদ্মা। সহচরী চরিত্র হিসাবে কাহিনীতে তার ভূমিকা অসামান্য। সে তাকে ভাটি বাঁকে তপস্যায় রত ইন্দ্রকে ছলনা করে পুত্রবর দান করতে বলে। তার দ্বারা তার পূজা প্রচার হবে।

"পদ্মা বোলে মাতা মোর জোড় কর।
ভাটি বাঁকে তপস্যা করে ইন্দ্র সুরেশ্বর।।
তাহাকে ছলিয়া তুমি দেহ পুত্রবর।
তবে পূজা মর্ত্তে হবে কহিলাঙ সকল।।"[৭৮]

এই যুক্তি করে চণ্ডী কৈলাশে আসে। শিব তখন বৃষের উপর চেপে ভিক্ষা করতে যায়। এরপর মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী ও শিবের দাম্পত্য জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের গঠন রীতি অনুযায়ী শিব-গৌরীর সংসার জীবন অংশটি সাধারণত বিবাহের পর বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানিক দত্তের কাব্যে একটু আলাদা। তিনি গণেশ ও কার্তিকের জন্মের পর সেই অবকাশটুকু অতিক্রম করে অসুর দলনী দেবী দুর্গার রূপ, দুর্গা থেকে কালীর জন্ম-রহস্য, ইন্দ্র সভা থেকে পুত্র পালনের জন্য পঞ্চদাসী প্রাপ্তি, মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য শত্রু ধূম্রাসুরকে বধ, মর্ত্যে কলিঙ্গ নগরে তার দোহরা নির্মাণ, গায়েন মানিক দত্তের দ্বারা দেবীর পূজা প্রচার, আবার কলিঙ্গর রাজ সুরথকে তার দশভুজা ও ত্রিনয়নি রূপের রহস্য ব্যাখ্যান এবং বিজু বনের সৃজন ও তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে গৌরীর সংসার জীবনে প্রবেশ করেছেন। কাহিনী গ্রন্থনে এই বিষয়টির অবস্থান ঘটনার কালানুক্রমিক বিকাশের অনেকটাই পড়ে। মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি অনুযায়ী কাহিনী গ্রন্থনে শিব-গৌরীর বিবাহ ও সংসার জীবনের মাঝে অনেক ঘটনার সহাবস্থান ঘটেছে। তাতে মনে হয়, কাহিনী গ্রন্থনার দৃঢ়পিনদ্ধতা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে।

কবি মানিক দত্ত শিব-গৌরীর সংসার জীবনের বর্ণনা স্বল্প পরিমাণে দিয়েছেন। কবি চরিত্রকে বেশি প্রাধান্য দিতে গিয়ে ঘটনার জাল বুনেছেন। এই কাব্যে তিনি শিব ও গৌরীর দ্বন্দ্ব এবং তাদের প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী করে দেখানোতে বেশি মনোযোগী। শিব গৃহে সম্বল নেই বলে ভিক্ষায় বের হয়। অন্যদিকে, ভিখারী শিব যে 'ত্রিদশের ঈশ্বর' একথা পাঠককে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে। ভিখারী শিব ডুম্বুরু ও শিঙ্গা বাজিয়ে নগরে ভিক্ষায় বের হয়। সে উজান ভাটিতে ভিক্ষা করতে গেলে কোচ বাড়ির বধূরা তাকে ভিক্ষা দেয়। কবির কথায় —

"শিব ভ্রমে উজান ভাটী   চৌদিকে কোচের বাটী
কোচ বধূ ভিক্ষা দিল থালে।"[৭৯]

এর সঙ্গে তিনি সমাজের বিভিন্ন জীবিকা ভিত্তিক জাতির নামও তুলে ধরেছেন। সমাজের এই

রূপটিকে তিনি স্বল্প পরিসরেই সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকি, শিবের দাম্পত্য জীবন ও দরিদ্র গৃহে বস্তুগত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ভিক্ষা থেকে ফিরে এসে শিব দুই পুত্রকে কোলে তুলে নেয়। এখানে শিবের পিতৃসত্তা ও সংসারী রূপটি কাহিনীর মধ্যে সংযোগ ঘটানো হয়েছে।

"বেলা হৈল দুই প্রহর   মহাদেব চলিল ঘর
দুই পুত্র হৈল আগুয়ান।।
দেখিয়া পুত্রের মুখ   অন্তরে বাড়িল সুখ
পুত্র তুলি কোলতে করে।"[৮০]

ভিক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কোন্দলের সূত্রপাত হয়। অভাবের সংসারে দুই ভাইয়ের কোন্দল স্বাভাবিক। শিব তাদেরকে শান্ত করার জন্য ঋষি কন্যা গৌরীকে অনুরোধ করেছে এবং গৌরী তাদের শান্ত করে রন্ধন করতে যায়। শিবকে মহাযোগী ও গৌরীকে ঋষির ঝি বলার পাশাপাশি শিব-গৌরীর সংসার জীবনে লোকজীবনের সাধারণ রূপকেও একই সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায় বলা যায় — "মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ... তাই লৌকিক জীবনের পটভূমিতে আছে যে অলৌকিক পরিবেশ, পার্থিব মানুষের পেছনে আছে যে অপার্থিব দেবদেবীর রাজত্ব, তাও সুনিশ্চিতভাবে মানবিক রসে, ভাবনা-চিন্তায়, ভোগ-তৃপ্তিতে সিঞ্চিত।"[৮১]

এরপরই দাম্পত্য জীবনে আসে ভাঙ্গনের ছবি। তার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে দুর্গার পূজা প্রচার জনিত শিবের ঈর্ষা। তা কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত। কলিঙ্গ নগরে শিব-ভক্ত রাজা সহ সকলে আদ্যার পূজা করে। শিব দ্বারে আসা সত্ত্বেও রাজা তাকে দেখা দিল না। এতে শিব ক্রুদ্ধ হয় এবং সুরথ রাজাকে অভিশাপ দিয়ে চলে আসে। এই ঘাতপ্রতিঘাতের পর থেকে কাহিনী মোড় ফেরে। কাহিনীতে বৃদ্ধা রূপে দুর্গা ইন্দ্রকে ছলনার বিষয়টি সামনে আসে। এখান থেকে দেবী নিজেকে প্রতিষ্ঠার পর্ব অন্য মাত্রা পায়। সে তপস্যায় মগ্ন ইন্দ্রকে কচ্ছপদের পলায়নপরতার দ্বারা তপস্যা ভঙ্গ করতে সচেষ্ট হয়। সে বলে —

"ব্রহ্মার ব্রাহ্মনী আমি   শিবের ঘরনী
আর বিষ্ণুর ঘরের কমলা।
ঈশ্বরী পার্ব্বতী   সায় শাকাম্ভরী
জয় দেবী সর্ব্বমঙ্গলা।"[৮২]

এমনকি, দেবী চণ্ডী ইন্দ্রের মনে তার প্রতি প্রত্যয় এবং শিবের প্রতি অনাস্থা জন্মানোর জন্য অতীতের রামায়ণের ঘটনা এবং বর্তমানের শিবের কোচ গৃহে যাত্রার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে। অতীতের

ঘটনাটি হল শিব ভক্ত রাবণকে তার সন্তান প্রদানের অক্ষমতা এবং বর্তমানের ঘটনাটি হল নিম্নশ্রেণীর কোচ রমণীগণের সঙ্গে শিবের সম্ভোগ প্রবৃত্তির হীন চরিত্রের কথা কাহিনীতে উঠে আসে। এই রামায়ণের এবং কোচ রমণীর গৃহে যাত্রার ঘটনা দুটি ইন্দ্রের মন পরিবর্তনের কারণ হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়। তা সত্ত্বেও সে অটল। এই পরিস্থিতিতে দেবরাজ ইন্দ্রকে চণ্ডীর ভয়ঙ্কর ও সংহার রূপ দেখান হয়।

"সিংহের পৃষ্ঠে দিয়া পা বেগ্রে হেলাইঞা গা
অসুরে হানিল শেলের ঘা।
ইন্দ্র বলিয়া ডাক দিল   ইন্দ্র মস্তক তুলিয়া চাইল
ত্রি নয়ানী হৈল দশভূজা।।
দেখি ইন্দ্র ভয়ে পাইল   ভূমে দণ্ডবৎ কৈল
বারে ২ করয়ে প্রণতি।
আপনার নিজ মূর্ত্তি   আপোনি সম্বর মাতা
নিশ্চয়ে জানিলাম পার্ব্বতি।।"[৮৩]

দেবী চণ্ডীর অলৌকিক শক্তির ও ভয়ঙ্কর রূপের প্রতি বিশ্বাস জাগানোর পরই দেবী তাকে পুত্র বর দিতে পেরেছে। সম্ভবত, মধ্যযুগের আবহমণ্ডলে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাকে দেবীর মহিমার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এই অলৌকিক শক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

একই বস্তু ভাবনা থেকে দেবী শচীর সন্তান প্রসবের ঘটনাটি এরপর বর্ণিত হয়েছে। শচীর উদর থেকে দশ মাস দশ দিন পর পুত্রের জন্ম দেব-দেবীভাবনা পূর্ণ নয়; তা একান্ত মানব-মানবী কাহিনী। দেবতা তার আবরণ মাত্র। মনুষ্য সমাজে পুত্র জন্মের পর সুবর্ণ কাটারি দিয়ে নাড়ীচ্ছেদ, পঞ্চদিবসে পাঁচটি, নামকরণ, পঞ্চমাসে অন্নপ্রাসন ও পঞ্চবৎসরে চূড়াকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন রীতি-নীতি এখানে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই নীলাম্বরের জন্মের পর বিবাহ বিষয়টি কাহিনীর মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে। পিতা ইন্দ্র কর্তৃক পুত্র নীলাম্বরের বার বছর বয়সে বিবাহের জন্য তৎপর মধ্যযুগের বাল্য বিবাহ রীতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে কারণে নারদকে দিয়ে বিরাট নগরে চন্দ্র মুনির গৃহে যাত্রার প্রস্তুতি লগ্নে তার বাহন ঢেঁকির যে সজ্জার বর্ণনা দিয়েছে তা কাহিনীর মধ্যে অতিরিক্ত অংশ বলা যায়। তা একান্ত অবাস্তব ও লৌকিক উপাদান নির্ভর।

"ঢেকির চক্ষ নির্ম্মান কৈল সামুকের খুশি।
কন্ধ ফেলিয়া দিল কাপড়ের ঝুলি।।
ঢেকির কমরে বান্ধে শামুকের ঘাগর।

মুড়া ঝাটা বান্ধে নারদ গলাতে চামর।।
ঢেকির মাথাএ বান্ধে আম্রের শাখা।
ব্রম্ম মন্ত্র জপিল মেলিল দুই পাখা।।”[৮৪]

এই অবাস্তব ও হাস্যকর বর্ণনাকে লোকসম্মুখে বিশ্বাস জাগানোর পাশাপাশি ‘ব্রম্ম মন্ত্র’কে তুলে ধরা হয়েছে। অবশেষে নারদ কর্তৃক চন্দ্রমুনির কন্যা নীলাম্বরকে দান করা কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি সেকালের বিবাহ জীবন এবং তার পরবর্তী জীবন সুষ্ঠু সুন্দর হয়ে ওঠার জন্য উভয়ের রাশি গোত্র যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। এই বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর বিবাহ রীতির মিল আছে। কিন্তু নারদের অজ্ঞাতে নীলাম্বর বিবাহ করতে গেলে কাহিনীর মধ্যে শুরু হয় চাঞ্চল্যকর ঘটনার উন্মোচন। ক্রোধান্বিত হয়ে নারদ বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। ইন্দ্রের ক্ষমা প্রার্থনায় সে শান্ত হয়। সেই জন্য কবি মানিক দত্ত এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নারদ চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে অবকাশ পেয়েছেন। অতঃপর ছায়াবতীর সঙ্গে নীলাম্বরের বিবাহ হয়। বিবাহে ছায়াবতীকে গৌরীর মত দুইজন দাসী সহ বহু দানসমগ্রী দেওয়ার সামাজিক রীতি এখানে এসেছে। কবি লিখেছেন —

“দানে জোতুকে তুশীল দুইজন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গীয়া দিল রজত কাঞ্চন।।”[৮৫]

বিবাহের পর নীলাম্বরকে অভিশাপ দানের ঘটনাটি কাহিনীতে এসেছে। এটি দেবদেবীদের মানবরূপ গ্রহণ করার সুপ্রাচীন রীতি।

শিব পূজক নীলাম্বরকে নিয়ে শিব-দুর্গার দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। নারদকে সেই দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখান থেকে কাহিনীর মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে চরিত্রের সংখ্যাও কাহিনীর মধ্যে বাড়তে থাকে। সৃষ্টি হয় মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বৃত্তাকার উপকাহিনীর। শিব ও দুর্গার দ্বন্দ্ব নিরপরাধ নীলাম্বরকে নিয়ে। শিব বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের অধিকার কায়েম করতে চেয়েছে। অন্যদিকে, দুর্গা ন্যায্য কর্তব্যের খাতিরে নীলাম্বরকে তার পূজারী করতে ব্যতিব্যস্ত। এরূপ দ্বন্দ্বের বীজ পূর্বেই ইন্দ্রকে পুত্র বর দেওয়ার মধ্যে নিহিত ছিল। তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ শিব ও দুর্গার দ্বন্দ্ব।

“জন্মিয়া আমার বরে না পূজে আমাকে।
পুষ্প তুলি নীলাম্বর পূজিব শিবকে।।
শিব ঠাকুর বলে দুর্গা বলিএ তুমাকে।
ভক্তের পুত্র ভক্ত পূজিবে আমাকে।।”[৮৬]

লড়াইয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে উভয়ের দেহ নিষিক্ত ঘর্ম থেকে অলৌকিক ভাবে ধর্মকেতু, নিসানকেতু,

নিদয়া ও কমলা নামে চরিত্রের জন্ম হয়। কাহিনীতে চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই চারি ব্যাধ চরিত্রকে নিয়ে সম্পূর্ণ একটি উপকাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। এই উপকাহিনীটি নীলাম্বরকে ছলনার কাছে কবি কাহিনীতে ব্যবহৃত করেছেন। দুর্গা নীলাম্বরকে নিরপরাধে জোর করে অভিশাপ দিতে চেয়েছে। মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য নিরপরাধ ভাবে তাকে তার পূজারি করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। অথচ এই অগৌরবের, নির্মমতার পথ ধরেই দেবীর পূজা প্রচার সম্ভব হয়ে ওঠে। স্বার্থ চরিতার্থ করার যুপকাষ্ঠে দেবী হরিণী বেশ ধারণ করে। ধর্মকেতু ও নিশানকেতু নামে ব্যাধদ্বয় তাকে শিকার করতে ধনুর্বাণ নিয়ে ছোটে। এই দৃশ্য বীজুবন থেকে নীলাম্বর দেখে মর্ত্যের আনন্দময় স্বাধীন জীবনের কথা ভেবে দুঃখ করতে থাকে। ক্ষুধায় ও দুঃখে কাতর চিত্তে নীলাম্বর ভাল মন্দ উভয় ধরনের ফুল উৎপাটিত করে। সেই পরিস্থিতিতে তার চরিত্রের পক্ষে তা স্বাভাবিক। তার এই অন্যমনস্কতায় দুর্গা চাটিরূপে ফুলের ভিতর আত্মগোপন করে এবং শিব পূজার সময় তাকে দংশন করে। তাতে শিব ক্রুদ্ধ হয় এবং নীলাম্বরকে অভিশাপ দেয়। শিবের এরূপ অভিশাপের কারণ কাহিনীর মধ্যে পূর্বপরিকল্পিত।

এরপর স্বাভাবিক ভাবে কাহিনী স্বর্গপুর থেকে মর্ত্যে অবতরণ করে। নিদয়াকে স্বপ্নে পুত্র দানের মধ্যে সামাজিক সত্য লুকিয়ে আছে। নিদয়ার মত মধ্যযুগের সকল নারীর পুত্র লাভ করা আকাঙ্ক্ষার ধন ছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের প্রথানুয়ায়ী কাহিনীতে স্বপ্ন দ্বারা তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নিদয়ার পুত্র সন্তানের জন্য দুঃখ ছিল বলেই বোধ হয় দেবী পুত্র সন্তান প্রদান ও তার প্রতি প্রকৃত দয়া। এটা কাহিনীতে নারী মনস্তত্ত্বের সামাজিক সত্যতাকে প্রমাণ করে। আশিস্‌কুমার দে সঙ্গত কারণে বলেছেন — ‘‘নিদয়াকে দেবীর পুত্রলাভের স্বপ্নদান তাই সামাজিক সত্যের এক প্রতিফলন। সামাজিক আকাঙ্ক্ষা (পুত্র লাভ) নিদয়ার স্বপ্নের কারণ। দেবী সেই কামনাপুরণের অনুপ্রেরক মাত্র।’’[৮৭] অন্যদিকে, দেবী নিশানকেতুর স্ত্রী দয়াবতির গর্ভে ফুল্লরাকে স্বপ্নে দান করে। কবির ভাষায় —

‘‘জেইখানে দয়াবতি শুইঞা নিদ্রা জায়।
শিয়রে বসিয়া দুর্গা স্বপন দেখায়।
*   *   *
হের ধর কন্যা খানি দিলাঙ তোমার তরে।
ফুলরা বলিয়া নাম রাখিবা ইহারে।।’’[৮৮]

লক্ষণীয়, কাহিনীতে ধর্মকেতুর স্ত্রী নিদয়া এবং নিশানকেতুর স্ত্রী কমলা নাম হওয়া সত্ত্বেও এখানে দয়াবতির উল্লেখ রয়েছে। এমনকি, ফুল্লরার পূর্বজন্মের কোন নামেরও উল্লেখ নেই। কাহিনীতে এরূপ যোগসূত্র হীন ঘটনাও পাওয়া যায়।

তবে কালকেতুর জন্মের পর বাঙালীর রীতি-নীতিগুলি স্বাভাবিক ভাবে এসেছে। এটি মঙ্গলকাব্যের মূল কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই নিয়ম-নীতির সঙ্গে নীলাম্বরের জন্মের সময় পালিত নিয়ম-নীতির হুবহু মিল রয়েছে। নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জাতি বলে নতুন করে কোন নিয়ম নীতি বর্ণিত হয়নি। কালকেতু শৈশব থেকেই বীর ও শিকারে পারদর্শী ছিল। ব্যাধ সন্তান রূপে তাকে হয়তো শ্রোতা মণ্ডলীর সামনে এমন বীর ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। পিতার সঙ্গে স্নানের সময় কালকেতুর এই বীরত্বের ও বিক্রমের বিষয়টি এসেছে।

"ইটা গোটা মারে পড়ে সমুদ্রের পার।
পাথর গোটা মারে পড়ে লঙ্কার দ্বার।।"[৮৯]

এরপর আসে কালকেতুর বিবাহ-বিষয়। সেখানে কালকেতুর বিবাহের কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই। যেন ঘটনার আবর্তে কালকেতুর বিবাহ বিষয়টি কাহিনীতে ভেসে চলেছে। সেখানে ধর্মকেতু সরাসরি তার পুত্রের সঙ্গে স্বর্ণকেতুর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেয়। লক্ষণীয়, কাহিনীতে ফুল্লরার পিতার নাম নিশানকেতু ও স্বর্ণকেতু দুটি নাম পাওয়া যায়। কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহে উচ্চ হিন্দু-বিবাহ রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। সেখানে পণ্ডিত ডেকে পঞ্জিকা দেখেই বিবাহ ঠিক করা হয়। বিবাহের বর্ণনায় যে সকল বাদ্যযন্ত্রের কথা এসেছে তাতে শিষ্ট সমাজ ও লোক সাধারণের বাদ্যযন্ত্রকে একত্রিত করা হয়েছে। নিম্নশ্রেণীর ব্যাধকুলের বিবাহে শিষ্ট সমাজের এই দামামা, দগড়া, রাইবাশ বাদ্যযন্ত্র পরিবেশ অনুযায়ী অনুকূল না হলেও বিবাহ সভায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বসতে হরিণের চামড়া দেওয়ার মধ্যে সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি বর্ণনায় কবি সমতা বজায় রেখেছেন। এছাড়া কালকেতুর বিবাহে উচ্চবর্ণের ন্যায় দান স্বরূপ পাঁচজন নর্তকি, দেড় বুড়ি কড়ি, কালো দড়ি ও 'শুকতের টোনা' বা শুকনো পাতায় মন্ত্র পড়ে বস করার উপায়ও প্রদান করা হয়েছে। তাতে কাহিনী গ্রন্থনায় হিন্দু সমাজের বিবাহ রীতির সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিবাহ পদ্ধতির সংযোগ সূত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কালকেতুর বিবাহের পর ধর্মকেতু, নিদয়া এবং নিশানকেতু, কমলা ইত্যাদি চরিত্রকে নিয়ে গঠিত উপকাহিনীটি মূল কাহিনী থেকে আকস্মিক ভাবে বিদায় নিয়েছে। কালকেতু ও ফুল্লরার জন্ম ও বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য কবি এই উপকাহিনীর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কিন্তু মূল কাহিনী থেকে এই উপকাহিনীটি বিদায়ের কোন সম্ভাব্য কারণ বর্ণিত হয়নি। ধর্মকেতু ও নিশানকেতু শিকারে বের হলে দেবী চণ্ডী তাদের চোখে কাল হয়ে বসে। চণ্ডীর ছলনায় তারা একে অপরকে পশু মনে করে উভয় উভয়কে বাণ বিদ্ধ করে এবং তারা মারা যায়। এরূপ মৃত্যুতে কবি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পুষ্ট রীতিকে তিনি নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জাতির ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করেন নি। কবি বলেছেন —

"কাল হয়া বৈসে দেবি দুহার চক্ষের মাঝার।
দুহারে দেখিল দুহে পশুর আকার।।
দুয়ে ছাড়িল বাণ দুয়ে লৈল দুয়ের প্রাণ
মরিয়া গেল স্বর্গ ভুবন।"[৯০]

কিন্তু ধর্মকেতু ও নিশানকেতুর মৃত্যুর পরে কোন্ কারণে তাদের দুই স্ত্রী নিদয়া ও কমলার মৃত্যু হল তার কোন কার্যকারণ যোগ নেই। তাদের উপকাহিনীটি রহস্যময় রয়ে গেল। এবারে কাহিনীতে এসেছে কালকেতুর সংসার ধর্মের কথা। কালকেতু সকলের মৃত্যুর পর সকল বিধি কর্ম করল। কবি কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে এই সকল চরিত্রের প্রয়োজন বোধ করেন। তাদের জন্ম, বিবাহ, সন্তান প্রসব, সন্তানের বিবাহ এবং সংসার ধর্ম পালনের জন্য বনে শিকারে গিয়ে দেবীর ছলনায় মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে একটি বৃত্তাকার প্লটের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও সেই প্লটের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তবুও প্রকৃত জীবন বৃত্ত বলতে যা বোঝায় তা কাহিনীর মধ্যে স্বল্প পরিসরে ছিল।

এই জীবন বৃত্তটির পর কালকেতুর জীবিকাবৃত্তির সূচনা হয়। কাহিনী কালকেতুর গৃহে এসে পৌঁছায়। সেই শিকারজীবী ব্যাধ জীবনের কথা বলতে গিয়ে কালকেতুর মহিষ বধে কৃষকদের আনন্দের কথা আমাদের সেসময়কার কৃষিতে মহিষের অত্যাচারের বিষয়টি স্মরণ করে দেয়। মহিষ বধের পরই কবি বাঘ বধের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বাঘের বিভিন্ন দেহাংশের উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রোতাদের সম্মুখে লোক সাংবাদিকতা করেছেন। কাহিনীর মধ্যে এমন করে লোক ঔষধ ও দ্রব্যাদির বর্ণনার দ্বারা শ্রোতাদের আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কবি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন-জীবিকাকে সন্নিবেশিত করেছেন। সেখানে সন্ন্যাসী বাঘের চর্ম আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে, ধনীরা বাঘের নখ সোনা জড়িয়ে গলায় দেয়, বৈদ্য বাঘের হাড় দেহ-প্রবিষ্ঠ বিষকে জল করার প্রয়োজনে, ডোমরা বাঘের তেল নেয় বাত কমাতে এবং বাঘের দাড়ি কিনে নেয় শত্রু নিঃশেষ করার জন্য। মূল কাহিনী বিচ্যুত সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত এই অংশটি কাহিনী গ্রন্থনের ক্ষেত্রে একেবারে অপরিহার্য না হলেও গায়েন কবির পক্ষে এই বর্ণনা স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তিনি কালকেতুর পশুশিকারের মত অপরিহার্য অংশের উল্লেখ করতে গিয়েও সমাজমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। কালকেতু বনে কোন উপযুক্ত পশু দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়। সেই অবস্থায় সে রামনাম গান করতে থাকে। মঙ্গল ও কল্যাণময় রামনাম গান শুনে হরিণী মোহিত হয়ে পড়ে।

"পঞ্চম আলাপিআ রাম নাম গান করে

হরিনি মঙ্গল শুনে।।"[৯১]

নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ সমাজেও রামনামের ব্যাপকতা প্রকাশ পায় এবং তার স্বর্গীয় মাধুর্যভাবে তন্ময় হয়ে যায় হরিণী। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — "ব্যাধচণ্ডালাদি নীচ জাতীয় লোকও কথকের মুখে রামায়ণ মহাভারতাদি শ্রবণ করিতে পাইত।"[৯২] নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ কালকেতু সম্ভবত এরূপ কথকের মুখ থেকেই শুনে থাকবে। এই রাম নামের প্রতি যে মানুষের দুর্বল চিত্ততার দিক রয়েছে তাকে সেই সুযোগে কালকেতুর শিকারে কাজে লাগানো হয়েছে। মৃত্যুকালেও হরিণী কালকেতুকে রামনাম করতে বলেছে। হরিণী কালকেতুকে বলে —

"তিলেক বিশ্রাম করি   রাম নাম গান করো
শুনিতে জাওক পরাণ।"[৯৩]

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ 'লঙ্কা কাণ্ড'-এ এরূপ ভাবে প্রকাশ রয়েছে —

"রামনারায়ণ নাম বলে সেই জন।
রথেতে পাঠায় যম বৈকুণ্ঠভুবন।।"[৯৪]

রামনামের পবিত্র, সত্য ও ব্রহ্ম বাণী শ্রবণে যাতে প্রাণ যায় তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে হরিণী; তাহলেই তার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। এমনকি, কালকেতু রামকথা জানার জন্য হরিণীকে পণ্ডিত বলেছে। সেই পণ্ডিতকে হত্যা করে কালকেতু তার দক্ষিণ হস্ত, ধনুক পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছে এবং তার মাথায় যাতে বজ্র পড়ে তার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে। এমনকি, হরিণীর কথায় সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে। সে কালকেতুকে বলে —

"আমার মাংস কিঞ্চিত   ব্রাহ্মণেক দিয় দান
তবেশে পাপ হরিনি স্বর্গ পুরে জান।।"[৯৫]

সমকালে গৌড়ে রামভক্তি এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের অধিকার সর্বোচ্চ ছিল বলে মনে হয়। এই সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবনাকে মানিক দত্ত কালকেতুর পশু শিকার অংশে প্রকট করে তুলেছেন।

স্বাভাবিক ভাবে কাহিনীর পারম্পর্য অনুযায়ী মাংস বিক্রয়ের ঘটনাটি আসে। সেখানে কালকেতুর শিকারে প্রাপ্ত মাংস নিয়ে স্ত্রী ফুল্লরা শ্রীকলার বাজারে বিক্রয়ের জন্য যাত্রা করে। সেই বাজারের পটভূমিকায় উঠে এসেছে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থানের চিত্রটি। নিম্নশ্রেণীর ব্যাধবধূ ফুল্লরার কাছে নগরের মহাজন ক্রেতাদের কুদৃষ্টি তাদের দারিদ্র্য জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে 'ব্যাধিনী' বলে সম্বোধন করার মধ্যে তার সামাজিক স্থানটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তেমনি তার আত্মসম্মান বোধটিও সেক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, সংসারে স্বামীর কাছেও তার কোন ভালোবাসা ও সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। নিরুপায় এই নারীটির সাংসারিক প্রয়োজনে এবং

সামাজিক অবস্থানের চাপে পড়ে কান্না ও অদৃষ্টের উপর দোষারোপ ভিন্ন তার অন্যপথ খোলা নেই।

"মাথায়ে মাংসের ডালি বেড়াইমো বাড়ি বাড়ি
লোকে ব্যাধিনি কহিবে আমারে।।"৯৬

তবে ফুল্লরা চরিত্রের স্বভাব পরিস্থিতির অনুকূল করে বর্ণিত হয়েছে। এই অবস্থার থেকে উদ্ধারের জন্য ফুল্লরা দেবীর ছলনার সম্মুখীন হয়। সেই ছলনা বর্ণনায় বিনিময় প্রথার স্বরূপটি উঠে আসে। সমকালে কড়ি দ্বারা সবরকম জিনিসপত্র কিনতে হত; এই প্রথার পরিচয় পাই ছদ্মবেশী দেবীর ফুল্লরার কাছ থেকে মাংস ক্রয় করার সময়।পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়ে ফুল্লরার কাছ থেকে মাংস ক্রয় করলেও পরক্ষণে দেবী তাকে নিঃস্ব করেছে। সেই চিত্র অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

"পঞ্চাশ কাহন কড়ি পায়া হরশিত হৈল মায়া
ফুলুরা নড়িল ধীরে ধীরে।"৯৭

নিঃস্ব কালকেতু ও ফুল্লরার আত্মধিক্কারে উঠে এসেছে গামছা বিক্রেতা ব্যক্তিদেরও চাকর-নফর নিয়ে জীবন যাপন করার মত স্বপ্ন। তার মত দরিদ্র জীবনে এরূপ সুপ্ত মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন স্বাভাবিক। কালকেতু দুঃখময় সংসার জীবনের প্রতি অতিষ্ঠতার প্রসঙ্গে সমাজ সচেতন কবি মানিক দত্ত শ্রোতা-পাঠকের আকর্ষণ বা মনোসংযোগ ঘটিয়েছেন একটি দৃঢ় বাস্তব সত্য বা নীতিকথার প্রতি। ফুল্লরা এই বিষম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের আশ্বাস কালকেতুকে দিয়েছে এইভাবে —

"প্রভু পুরূস হয়া না হইয় কাতর।
পুরূস কাতর জারা স্ত্রিয় বিদায় দেয় তারা
ফুলুরা জাইবে অন্যতর।।
প্রভু পুরূসের দশ দশা কখন গরিব কখন রাজা
কখন হৈতে পারে দণ্ডের মদন।
পৃথিবীতে ঝড় হয় সেহ কতক্ষন রয়
দুখ সুখ প্রভু পূর্ব্বেকার ভজন।।"৯৮

ফুল্লরার এই নীতিকথার মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যতে কালকেতুর রাজা হওয়া এবং তাদের রোমান্টিক জীবনের মূল সূত্রটি। কাহিনীতে এরূপ যোগসূত্র স্থাপন গঠন কৌশলের দিক থেকে পাঠক শ্রোতাদের আগাম চমকপদ অবস্থা পরিবর্তনের কৌতুহলোদ্দীপক পূর্বাভাস বলা যেতে পারে।

এরই মাঝে মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুযায়ী পশুগণের গোহারী বর্ণিত হয়েছে। সেই

প্রসঙ্গে পশুগণের আর্তনাদ যন্ত্রণা প্রকট বা জীবন্ত করে তোলার তুলনায় দেবী চণ্ডীর নতুনতর স্বরূপ উন্মোচনে কবি বোধ হয় বেশি আগ্রহী। পশুগণের গোহারী অংশে দুর্গার সঙ্গে কালীকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। একে একে বেজি, বাঘ, নেউল, হাতি, ঘোড়া, বিড়াল, কুকুর, শৃগাল, হরিণ, শোশক প্রভৃতি পশু তাদের বিপন্ন অবস্থার কথা দেবীকে জানায়। কালী তাদের পালন বা রক্ষা করেছে। যে কালী অসুরের ধ্বংসকারিণী সেই কালীই বিপন্ন পশুদের পালনকর্তা। এই প্রথাগত ধারণাটি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে। তবে পশুগণের গোহারী অংশে পশুদের তুলনায় কালকেতুর চরিত্রের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার চরিত্রানুযায়ী এই বর্ণনা সুসঙ্গত হয়েছে। শুধু কালকেতুকে নয়; দেবী চণ্ডীকে অন্যরূপে এখানে দেখানো হয়েছে। সে কালী রূপিণী; ভক্তের পালনকর্ত্রী। হরিণীর গোহারী অংশ এক্ষেত্রে তুলে ধরা হল —

"দুইটা হরিনি আমি নওাইল মাথা।
কান্দিয়া২ কয় আপন দুঃখের কথা।।
বনের তিন্ন খাইয়া বীরের কিবা ধারি।
আপনার মাংস জগত হৈল বৈরি।।
তারে বর দিল কালি জগতের মাতা।"[৯৯]

পশুদের গোহারী সম্বন্ধে কবির পূর্ণমাত্রায় বস্তুগত পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। কালকেতু সংসারের প্রয়োজনে পশুহত্যা করেছে। পশুরা সমকালের নিষ্পেষিত সমাজ। সেই পশুদের বিভিন্ন দেহাংশ (হরিণীর মাংস, শোশকের হাত-পা, কান) অন্যদের মনোরঞ্জনের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিপন্ন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য পশুদের মত মানুষকেও শক্তিদেবীর দ্বারস্থ হতে হয়েছিল।

এই দুঃখময় অবস্থায় কবি মানিক দত্ত অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কালকেতুর দুঃখময় জীবনে হাস্যরসাত্মকময় ভোজন বর্ণনায় প্রবেশ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। পশুদের গোহারী অংশটি তিনি সচেতন ভাবেই কাহিনীর মধ্যে স্বল্প পরিসরে গুটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কাব্যে কালকেতু ও ফুল্লরার সংসার জীবনের কথাই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কবি পশুদের গোহারীর ঘটনা বলেই হঠাৎ অপর একটি গল্পে প্রবেশ করার মত কৌশলে কালকেতুর গৃহ বর্ণনায় মনোনিবেশ ঘটিয়েছেন। উভয় ঘটনার সঙ্গে কোন কার্যকারণ সূত্র বর্ণিত হয়নি। কবির বর্ণনা ভঙ্গিতে তার প্রমাণ মেলে —

"সভাকারে বর দিল সর্ব্বমঙ্গল।
পশু বর দিল মাতা মঙ্গলচণ্ডীগণ।।
কালকেতুক নএগ কিছু শুন বিবরণ।
আপন গৃহেতে হইল বীরের গমন।।"[১০০]

কালকেতুর ক্ষুদ্রপাতে সাতহাড়ি আম্বানি ফুল্লরার ঢেলে দেওয়া অভাবের সংসারে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। কালকেতুর আম্বানি খাওয়ার ভঙ্গিতে কবি হাস্যরসিকতা করেছেন। দুঃখময় ও অভাবে জর্জরিত সংসারে এরূপ খাদ্যের সমাবেশ রোমান্টিক ভাবনা বা অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। কবির ভাষায় —

"খুদিআ মাণের পত্র আনিল কাটিআ।
সাত হাড়ি আম্বানি দিলেন ঢালিআ।।
পত্রে না রয় আম্বানি গড়াগড়ি জায়।
ক্রোধ হএগ্রা মহাবীর মৃত্তিকা মিশায়।।
পিষ্ঠের পাছে দুই গোপ ফেলিল বান্ধিআ।
আমানি খায় বীর হামকুড়ি দিআ।।
ছয় বুড়ি কুচিলা খাইল নয় বুড়ি ধুতুরা।
আড়িতে মাপিআ খাইল জটিয়া ভাঙ্গের গুড়া।।"[১০১]

কালকেতুর ভোজনরসিকতার পরেও তার চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য পুনরায় শিকার যাত্রার ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে কালকেতু চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে কাহিনীকে ধনিয়াডাঙ্গা বন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার সঙ্গে এক বানিয়ার সাক্ষাৎ হয়। তার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কালকেতুর আত্মসম্মানবোধটি বড় করে তোলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উপায় স্বরূপ বেছে নেওয়া হয়েছে একটি তুচ্ছ এবং চরিত্র পরিপন্থী ঘটনাকে। সেই ঘটনাটি হল অলৌকিক শক্তিসম্পন্না দেবী চণ্ডী কর্তৃক কালকেতুর চোখে ধুলো দেওয়া। এই ঘটনাটি যেমন হাস্যকর তেমন দেবী চরিত্রের বাতানুকূল নয়। একেবারেই লৌকিক চিত্রকে যেন কাহিনীর মোড় ফেরাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কবির কথায় —

"য়েক মুঠা ধূলা দুর্গা হস্তে করিআ।
কালকেতুর চক্ষেত মাতা মারিল ছিটিআ।।"[১০২]

এরপরই কাহিনীতে কালকেতুর ধনপ্রাপ্তির সুপরিচিত অংশটি বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ অত্যাচারিত পশুসমাজকে রক্ষার জন্য দেবীর কালকেতুকে ধনদান করার উদ্দেশ্যে কাঁচুলি নির্মাণ ও তা দিয়ে ছলনার প্রসঙ্গটি কাহিনীতে আসে। তবে এই অংশটি কবি শুরু করেছেন সমকালের রামভক্তি দিয়ে। সেখানে বলা হয়েছে — "শ্রী শ্রী রাম করুনা নাচাড়ী।/ ধনবরের পালা আরম্ভ।।"[১০৩] এখানে কালকেতু বনে পশু না পেয়ে কাঁদতে থাকে এবং সে সময় মায়ামৃগ রূপে দেবীর আবির্ভাবে তার চরিত্রের এক নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মৃগ শিকার করতে কালকেতু যে বাণ ছাড়ে তা এখানে রূপকথার মত ভক্তপ্রাণে পরিণত হয়েছে। বাণ দেবীর উদ্দেশ্যে বলে —

"বাণ বলে মৃগ তুইরে পলাবু কতদূরে।
আমার বিধাতা বৈলাছে মৃগ তোমাক বধিবারে।।"[১০৪]

কালকেতু কর্তৃক বন্ধনে ভক্তবৎসল দেবীর কার্তিক ও গণেশের প্রতি মাতৃস্নেহের ধারা ঝরে পড়েছে। সেই সঙ্গে দেবতা হয়ে মনুষ্যজাতির হাতে বন্ধন — দেব সমাজে তা কলঙ্কের কারণ। এমনকি, স্বামী তাকে সম্ভ্রম ভ্রষ্টের জন্য গৃহে তুলবে না। দেবীর এই দুটি সামাজিক সচেতনতার বিষয় আলোকপাত করার পরই কাঁচুলি নির্মাণের বিষয়টি কাব্যে এসে ভীড় করেছে। যদিও মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি অনুযায়ী এই অংশটি অপরিহার্য। তবে কবির চার প্রকার কাঁচুলি নির্মাণের বিষয়টি অনেকটা বিস্তৃত করেছেন। তার পরিচিত বস্তুজগতের বিভিন্ন লোক উপাদান ও সমকালে প্রচলিত রামায়ণ ভাবনা কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তার ফলে কাহিনী গ্রন্থনায় প্রচুর দেবতার নাম, পুষ্পের নাম, পাখির নাম, মৎস্যের নাম ও প্রসঙ্গক্রমে পুরাণের প্রসঙ্গ এসেছে। সেই সঙ্গে অনিবার্য কারণ বশত কাহিনীতে চিত্রগোবিন্দ চরিত্রটির আগমন ঘটে। চিত্রগোবিন্দ দ্বারা নির্মিত দেব-কাঁচুলিতে বিভিন্ন পুরাণের দেবতার নাম এবং তাদের লোক বাহনের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ধর্ম, ব্রহ্মার হংস, নারায়ণের গরুড়, শিবের বৃষ, ভগবতীর সিংহ, গণেশের ইঁদুর, কার্তিকের ময়ূর, জলধরের ধবল ঘোড়া, ইন্দ্রের হাতি, শমনের মহিষ, পবনের হরিণ, গঙ্গার মকর, কালিকা গোসানীর মরা, সরস্বতীর শ্বেতকাক, লক্ষ্মীর পেঁচা, নারদের ঢেঁকি, ষষ্ঠীর বিড়াল প্রভৃতি পুরাণ এবং পুরাণ বহির্ভূত দেবদেবীর নাম তালিকা ও বাহনের নাম কাহিনীতে অতিরিক্ত সংযোজন ঘটেছে।

লক্ষণীয়, কবি দেব-কাঁচুলি নির্মাণে প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী ধর্মের নাম উল্লেখ করে অন্যান্য দেবদেবীর নাম ক্রমান্বয়ে সাজিয়েছেন। দেব-দেবীদের স্বরূপ ও বাহনের বর্ণনায় লোকবিশ্বাস কতকটা কার্যকর হয়েছে। অতঃপর তিনি পুষ্প কাঁচুলি নির্মাণের প্রসঙ্গে এসেছেন। সেখানেও তিনি আমাদের পরিচিত বহু ফুলের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন — তুলসী, কেয়া, কেতকী, যূথি, মালতি, পারিজাত, ওলট, চাপা, নাগেশ্বর, কমল, শ্বেত জবা, রক্ত জবা, কেলী, কদম্ব, গোলাপ, বক, মাধবী, শেফালি, ধুতুরা, সুন্দি, শালুক, রক্তহলা, সূর্যমণি, দ্রোণ, বিষ্ণুপদী, ভূমি, চাপা ইত্যাদি ইত্যাদি নীলবর্ণের, শ্বেত বর্ণের সকল ফুলের উল্লেখ আছে। মৎস্য কাঁচুলি বর্ণনায় গ্রামে প্রাপ্ত দাড়িকা মাছের কথা বলেই কবি তিমি মাছের কথা বলেছেন। তিমি মাছের প্রসঙ্গে রামায়ণের ঘটনা অনুপ্রবেশ করেছে। তিনি কবিত্ব শক্তির সংযমবোধ ধরে রাখতে পারেন নি। সমকালে প্রচলিত রামায়ণের প্রতি শ্রোতাগণের আকর্ষণ এবং কবির সেই আকর্ষণের প্রতি মনোযোগ উভয়ই এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনে তিমি মাছ পাথর ভক্ষণ করছে এবং সেই তিমি মাছকে আবার ভক্ষণ করার জন্য গরুড়কে আমন্ত্রণ করার ঘটনা

এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বাল্মীকির রামায়ণের ‘কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড’-এর ৬৭ তম সর্গে অজগরের শিলা গ্রাসের কথা আছে এবং হনুমানের অনুরোধে গরুড় অজগরকে গ্রাসের উল্লেখ রয়েছে। আর কৃত্তিবাসী ‘রামায়ণ’-এর ‘সুন্দর কাণ্ড’-এ বর্ণনার সঙ্গে মানিক দত্তের এই বর্ণনার হুবহু মিল নেই। সেখানে বানর সেনারা সমুদ্রপথ কেবল বর্ণনা করেছে। এখানে গরুড় ও অজগর বা তিমির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বলা হয়েছে —

‘‘রাম জয় করিয়া বীর পর্ব্বতে দিল নাড়া।/ উপড়িয়া ফেলে যত পর্ব্বতের চূড়া।।

... শাল পিয়াল গাছ পড়িল আড়ভাতি।/ তথির উপরে ফেলে নল সেনাপতি।।[১০৫]

মানিক দত্ত বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের হুবহু ঘটনা অনুসরণ করেন নি। তিনি লোক প্রচলিত রামায়ণ কথাকে একটি কার্যকারণ সম্পন্ন ঘটনায় উপস্থাপন করেছেন বলে মনে হয়। এই তিমি মাছের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে রামায়ণের ঘটনা বলার পর কবি আবার বিভিন্ন মাছের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন — গাগড়, মৌরালী (মুরালী), সংকর, মাগুর, রুই (রুহি), কাতল, রিঠা (ইঠা), বাচা, শরপুটি (শেরণপুঠি), টেঙরা (টেঙ্গর), রাইম, চেলা, দারকা (ডারিকা), ভেদা (ভেদড়), কোদালী, রোয়াল (বোদালী), গজা (গাজাড়), শৌল (শৌল), ইলিশ (ইলিশা), খলশে (খলিশা), পাতাসি, মোয়া (মঞা) ও কাঁকিলা ইত্যাদি।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মৎস্য কাঁচুলির পর পক্ষী কাঁচুলির কথা বলা হয়েছে। সেখানে ক্রমে খগপতি, যে বিষ্ণু ভক্তি করে; টীয়া, তোতা, যে বিষ্ণুনাম বলে, বাদুড়, শারস (শারক), খঞ্জন, রাম শারস (রাম শারক), গাঙ্গ শারণ (গাঙ্গ শারক), কাল পেচা, ফেচুকা, লক্ষ্মী পেঁচা, রাঙ্গাটুলী, পাডুক, হরিতাল, গয়াল, বাঙ্গান, সাথকাল, হাড়ীচেচাঁ, সাতভাইয়া, ময়না (ময়েনা), টিটীহি, মোড়া, ময়ূর প্রভৃতি পাখির উল্লেখের পর যখন চকা (চখোয়া) পাখির প্রসঙ্গ আসে তখন তার সঙ্গে রামায়ণের সম্পর্ক কি তা অত্যন্ত কৌশলে ব্যক্ত করা হয়েছে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রামের সীতা হারানোর ঘটনা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সীতাকে অনুসন্ধান করতে রাম-লক্ষ্মণ চকা পাখির কাছে উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র তাকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে তাকে কর্কশ বাণীতে তার স্ত্রী রক্ষার অক্ষমতার কথা শুনিয়ে দেয়। তাই রামচন্দ্র তাকে অভিশাপ দেয় যে, একই স্থানে থেকেও স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো মুখ দেখবে না। আবার কানি বক তাকে সঠিক পথ নির্দেশ না দেওয়ার ফলে অভিশপ্ত হতে হয়। এরূপ রামায়ণ সম্পর্কিত নীতিকথার আভাস চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঁচুলি নির্মাণের বর্ণনায় পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন —

‘‘ময়ূর লেখিল আর চখোয়া সুন্দরে।/ বনবাসে রামচন্দ্র শাপ দিল জারে।।

পক্ষ কাচুলী লেখে বিচিত্র শোভায়ে।/ বাশের থোপে তেলাকুখা লাফে২ জায়ে।।

বাজ পক্ষ লেখিল জে জ্ঞাতি হত্যা করে।/ কানি বগ লেখিল শ্রীআর আশা করে।।

রাম অবতারে জখন সীতা চাহিআ ফিরে।/ লক্ষণ পুছিল কথা কানি বগের তরে।।

ই পথে দেখিছ সীতা গেল কোথাকারে।/ তোমাকে করিয়ে সুদ্ধি শুন সমাচারে।।

* * *

দুই ভাই আছিলা জদি হাতে ধনুক ধরি।/ দুই ভাই রাখিতে নারিলা এক নারী।।

ব্যর্থ ধনুক ধর ভাই দুইজন।/ দুই ভাই থাকিতে সীতা হরিল রাবণ।।

এতমত বক জদি করিল বিধর্ম।/ ক্রোধে জ্বলিল তবে রাজা রামচন্দ্র।।

* * *

আজি হৈতে কানী বক শ্রীআর আশা করে।/ চারি মাস বারিষাতে থাকিবে বাসরে।।

বকী তোকে পুষিবেক আনিয়া আহারে।/ উচ্ছিষ্ট খাইআ জীবে শুনবে বেটা পক্ষী।।"[১০৬]

মূল বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ময়ূর পাখির উল্লেখ আছে। তবে চখা ও বক পাখির এরূপ কথোপকথন ও অভিশাপের ঘটনা নেই। কিন্তু কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-এর অরণ্যকাণ্ডের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায় —

"শুন হে চখা পাখি বলিয়ে তোমারে।/ তুমি নাকি দেখিয়াছ মোর জানকীরে।।

... শুনিয়া চকোরা বলে কর্কশ বচন।/ আক্ষেপিয়া বলে পক্ষী কমললোচন।।

দুই মহাবীর তোরা দেখি ধর্নুদ্ধর/ এক স্ত্রী রাখিতে নার বনের ভিতর।।

... সহিতে না পারি তোর বিরূপ কথন।/ শাপ দিলে ব্যর্থ নহে আমার বচন।।

এক স্থানে থাকহ দম্পতি দুইজন।/ স্ত্রী পুরুষে নহে যেন মুখ নিরীক্ষণ।।

... বক বলে শুন প্রভু তুমি নারায়ণ।/ ... অনুমানে বুঝিলাম সেই সীতা সতী।।

... রাম বলেন বক তোরে বর দিলাম আমি।/ চারি মাস বরিষার পানি না ছুইবা তুমি।।"[১০৭]

এভাবে কবি মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে জনরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত কৌশলে রামায়ণের নীতিগান গেয়েছেন। পাশাপাশি অন্যান্য পাখিদের কথা বলতে গিয়ে সত্যযুগের ভারথ পাখির ডিম বোয়াল মাছ কর্তৃক ভক্ষণ এবং তা উদ্ধারের জন্য গরুড়ের আগমন প্রসঙ্গটি কাহিনীতে এসেছে। এভাবে একই ঘটনা প্রসঙ্গে ভারথ পাখি, তার সমস্যায় গরুড় পাখি ও তার অসম্মতি, পাখা খসে যাওয়া, পাখা চুরি, চোর ধকড়িয়াকে কোতাল ফেচুকার লাথি মারা, গরুড়ের ডানা ফিরে পাওয়া এবং গরুড় সাগর বন্ধন ও ভারথ পাখির ডিম রক্ষা ইত্যাদি কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত একটি ছোট কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে সমাজের চুরি, তার শাস্তি প্রদানে সভা গঠনের ব্যাপারটি। পক্ষী কাচুলির কথা বলতে গিয়ে কবি কখন এরূপ সমাজ সচেতনতা অথচ পুরাণের ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন তা পাঠক বা শ্রোতা বুঝতেই পারে নি। অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রোতার চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর কথা ভুলে গিয়ে এরূপ পুরাণের ঘটনায় মনোনিবেশ ঘটিয়ে ফেলেছে।

এরপর কাহিনী মূল শ্রোতে বহমান। পাঠক বা শ্রোতার আচমকা শ্রুতিভ্রম হয় এবং চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে মনোসংযোগ ঘটে।

চণ্ডী চারথান কাঁচুলির মধ্যে একটি পরিধান করে কালকেতুকে ধনদানের উদ্দেশ্যে যাত্রার ঘটনা পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি নারী চরিত্রের সন্নিবেশ সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর সম্পর্কের দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ গৃহে যাত্রার প্রাক্ মুহূর্তে পঞ্চদাসীকে চণ্ডী স্বামী শিবের উদ্দেশ্যে সামাজিক অপরাধের জন্য মিথ্যা কথা বলতে বলে। যাত্রা পথে তার মোহন রূপ দেখে নারদের উক্তিতেও শিবের অসৎ আচরণ তথা নিচু শ্রেণীর হীরা কোচের সঙ্গে অসামাজিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। কালকেতুর মত দরিদ্র গৃহে দেবী চণ্ডীর ধনপ্রদান বিষয়টিতে তাদের আর্থিক পরিবর্তনের আভাস পেয়েছে। প্রাকৃতিক জগতে মনোরম পরিবর্তনের আভাস যেমন কতগুলি গুণাবলীতে প্রতিফলিত হয় তেমনি কালকেতুর দরিদ্র সংসারে আর্থিক পরিবর্তনের প্রতিভাস কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

> ''কালকেতুর ঘরে আসে জগতের প্রাণ।
> বৃক্ষ ডালে থাকিয়া কোকিলে করে গান।।''[১০৮]

এই বর্ণনার পর কবি ছদ্মবেশী যোড়শী রমণী দেবী চণ্ডীর সঙ্গে ফুল্লরার সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে তার সতীনসমস্যা বিষয়টি উন্মোচনের কথা শ্রোতা বা পাঠককে শোনাতে চেয়েছেন। মানিক দত্তের ফুল্লরা দেবীকে সতীন সন্দেহে প্রথম এক বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর কাছে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। ফুল্লরার এই সমস্যাতে কবি অত্যন্ত কৌশলে পরিস্থিতি অনুযায়ী এই চরিত্রকে কাহিনীতে সন্নিবেশ করেছেন। সেখানে তার সমস্যা উত্থাপন করায় সে ফুল্লরাকে স্বামী কালকেতু আসার আগেই বিদায় দিতে বলে। ফুল্লরার সম্মুখ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এখানে নামহীনা মাসী চরিত্রটি কাহিনীতে এসে ভীড় করেছে। কিন্তু চরিত্রটিকে মধ্যযুগের নারীর সম্মুখ সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে কবি সঠিক নির্বাচন করেছেন। তাই তার কথায় ফুল্লরা সচকিত হয়ে বিপদ এড়ানোর পন্থা অবলম্বন করেছে। সেক্ষেত্রে ফুল্লরা তাকে উভয়ের জাতিগত ও আর্থিক অবস্থার পার্থক্য অত্যন্ত কৌশলে তুলে ধরেছে এবং ব্যাধিনী হওয়ার সামাজিক যন্ত্রণা তার সামনে তুলে ধরেছে।

সেই সঙ্গে কাহিনীতে নাটকীয়তা উন্মোচিত হয়। ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর কুল সচেতন করেছে এবং যৌবন রক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। একজন নারী অপর এক নারীকে তার রূপ সৌন্দর্য ও যৌবন সম্পর্কে সজাগ করেছে। যাতে দেবী চণ্ডী এত দুঃখের সংসারে থাকার তুলনায় স্বীয় রূপ-যৌবনের প্রতি সচেতন হয়। তাই ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছে। ফুল্লরার এরূপ স্ত্রী মনস্তত্ত্বের প্রকাশ প্রশংসার যোগ্য। কাহিনী গ্রন্থনায় আগন্তুক সতীনকে তাড়ানোর এরূপ কৌশল অত্যন্ত আশ্চর্যের ও চরিত্রের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে। ফুল্লরার বিচক্ষণ

বার্তায় চণ্ডী তাকে কটাক্ষ করে বলে যে, তার স্বামীও ভিখারী। সে দুই পুত্রকে নিয়ে এখানে থাকবে। এটাই তার মনোবাঞ্ছা। তার কটাক্ষপূর্ণ বাক্যবাণ ফুল্লরার হৃদয়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় এবং দেবী বলে —

"তে পথের মধ্যে আমি আছিলাম বসিয়া।
কালকেতু আনিলে মোকে সত্য বাক্য দিয়া।।"[১০৯]

সেই সত্যবাণী ফুল্লরার মত নারীর কাছে বেদনাদায়ক বটে। নিজের গৃহে নিজের অধিকার হারানোর যন্ত্রণা তার উপর বর্ষিত হয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনায় ও চরিত্রের হৃদয়ের যন্ত্রণা উন্মোচনের ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্রটিকে ফুল্লরার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সতীন সমস্যা ও কৌলীন্য প্রথার ভিন্ন চিত্র মানিক দত্ত তুলে ধরেছেন। তা কবির বস্তুপৃথিবীর অভিজ্ঞতা লব্ধ বলে মনে হয়। দেবী চণ্ডী ফুল্লরাকে কালকেতুর দেওয়া সত্যবাণী বলেছে। তা এরূপ —

"না করিব কুন কর্ম্ম থাকিব বসিয়া।
জে কিছু অন্নব্যঞ্জক রান্ধহ বসিয়া।।
অর্দ্ধেক অন্নবেঞ্জন আমার ভক্ষন।
আমার স্থানে শুন রামা উপদেশ বচন।।
তাহার অর্দ্ধেক পাবে কেতু আহিড়ী।
পাও বা না পাও রামা ফুলরা সুন্দরি।।
শুনিলে ভক্ষনের কথা হৈয়া সাবধান।
শয়নের কথা কই তোমার বিদ্যমান।।
দুই পুত্র কোলে করি কেতুর আগে শুইব।
তুমি পায়ে তৈল দিবা আনন্দে থাকিব।।
আলস্য লাগিলে জাতিবে হস্ত পাও।
গ্রীষ্ম লাগিলে দিবে দণ্ড পাখার বাও।।"[১১০]

তার প্রতি দেবী চণ্ডীর আঁটকুড়া অপবাদ শুনে ফুল্লরা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে গালাগাল দেয়। তা সত্ত্বেও ফুল্লরা ক্রমে অধিক বিচলিত হলে দেবী বলে — "অতি বেস্ত হৈলে ঘরে নাহি জাব আমি।।"[১১১] তখন নিরুপায় ফুল্লরা সতীন সমস্যা অতিক্রম করার জন্য বড় অস্ত্র ব্যবহার করে। সেটি হল তার বারো মাসের দুঃখ কষ্টের কাহিনী।

'ফুল্লরার বারমাসীয়া' মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর প্রথাগত রূপ। কেবল ফুল্লরার নিজের স্থান সতীন দখল করবে বলে সচেতন নয়, সেই সঙ্গে বারমাসে তার স্বামী কালকেতুকে কীরূপ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় এবং তার ফলে তার সংসার জীবনে কীরূপ অসহনীয় বাতাবরণ

নিয়ে আসে তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে ও কৌশলের সঙ্গে তুলে ধরেছে। কবি বাস্তব অভিজ্ঞ, দরদী ও মানবিক না হলে বোধহয় এরূপ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হত না। সেই বারমাস্যায় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, নিয়তির নির্মম পরিহাস, আশ্বিনের দশভুজার পূজা, অগ্রহায়ণে নবান্নের মত উৎসব এবং প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানব মনের সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে। তবে লক্ষণীয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বারমাস্যা বর্ণনা স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক। তাঁর কাব্যে বারমাস্যা জ্যৈষ্ঠ মাস দিয়ে সূচনা এবং বৈশাখ মাসে সমাপ্তি। কবি জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনায় বলেছেন —

"প্রথমে জৈষ্ঠ মাসে উথলিল বন।
হাথে গণ্ডিপ করি প্রভু ভ্রমিছে কানন।।
মৃগ পায়া প্রভু মোর হরিসে আইসে ঘরে।
মাথায়ে চোপড়ি করি জাঙ মাংস বেচিবারে।।"[১১২]

শ্রাবণ মাসের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনায় —

"শ্রাবণ মাসেত ইন্দ্র বরিষে পঞ্চ ধারে।
মৃগ না পায়া প্রভু সন্ধ্যাতে আইসে ঘরে।।
উধার করিতে গেইলো পড়সির বাড়ি।
না পায়া উধার কচুর শাক তুলি।।"[১১৩]

অগ্রহায়ণ মাসের নবান্নের বর্ণনায় —

"অগ্রান মাসেত শিঙ্গে বাহেরায়।
চর্ম্ম উড়ি ফুরে প্রভু বস্ত্র নাহি গায়।।
ঘরে ঘরে আনন্দ হয়ে নৌতুন ধান।
অন্ন বিনে দেখ মোর দগধে পরাণ।।"[১১৪]

বসন্ত ঋতুতে প্রাকৃতিক জগতে মিলনের মেলা সূচনা হয়। সেখানে কালকেতু ফুল্লরাকে গৃহে রেখে লোকালয়ে নিজের সম্ভোগ বাসনা তৃপ্ত করে। কিন্তু এই মিলনের পরিবেশে ফুল্লরার তনু মন জ্বলে যায়। আর বৈশাখ মাসের বর্ণনায় —

"বৈশাখ মাসেত নরে নানা ব্রত করে।
কেহো করে দান পূন্য ভব তরিবারে।।
পরলোক তরিতে আমার নাহি জ্ঞান।
রাত্রি দিনে পশু বধি সে সন্ধান।।
অভাগিনীর দুঃখের কথা শুনিলে য়াপুনি।
এতেকে চলহ তুমি বড়ার ঘরনী।।[১১৫]

বারোমাসের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনার চাতুরীর পরেও দেবীর প্রতিক্রিয়া না করলে ফুল্লরাকে বিশেষ একদিনের জীবনের সূক্ষ্ম প্রতিভাস তুলে ধরতে হয়েছে। তার মধ্যে ফুল্লরাকে মিথ্যার অবলম্বন নিতে হয়েছে। সেই মিথ্যাকে কেন্দ্র করে চণ্ডীর সঙ্গে তার বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বন্দ্ব চলেছে। তাই দেবী ফুল্লরাকে বলেছে —

"বীরকে ভাড়িয়া খাইয়া এই কথা বুঝাও।
সেহি চাতুরালী কথা আমাকে শুনাও।।
ভবানী কহিল কথা করিয়া কৌতুকে।
বাজিল বিশম শেল ফুলরার বুকে।।"[১১৬]

এই কথায় ফুল্লরা রাগান্বিত হলে তাকে চণ্ডী হিতবাণী বলে এবং সেই হিতবাণীই ধনদানের কারণ। সত্য-মিথ্যার সাধারণ কৌশলকে ধনদানের কারণ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। নিঃসন্তানবতী ও দরিদ্র ফুল্লরার কাছে দেবী কর্তৃক তাদের দুঃখ নিরসন করার আশ্বাসবাণী স্বাভাবিক। চণ্ডীর কথায় বিচলিত হয়ে ফুল্লরা বয়স্ক ও সমাজ অভিজ্ঞ মাসীর কাছে সমস্ত কিছু জানায়। তার কাছে দেবী চণ্ডীকে রেখে কংস নদীর তীরে কালকেতুর কাছে যায়। সেখানে কালকেতুর জলের উপর ধ্যানস্থ রূপ পূর্ব ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। কবির কথায় — "জলেত তপস্যা করে ব্যাধের নন্দন।।"[১১৭] কালকেতুকে ফুল্লরা চাপড়ের ঘা দিয়ে জাগ্রত করল এবং অন্যের নারী হরণ করা পাপ কর্ম — এ বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিল। সে নারী ফুল্লরার কাছে দেবকন্যা বলে মনে হয়েছে। রামের মত দেবতার স্ত্রী হরণে রাবণের পাপ কর্মে রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কালকেতুও সেই একই পাপ কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে রামায়ণের রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পাপের কথা এসেছে। রামায়ণের ঘটনা বর্ণনার দ্বারা মানিক দত্ত পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট এবং সতর্কীকরণ করার একটি অভিনব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। তিনি পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে সমগ্র রামায়ণকে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন। সেই সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ফুল্লরা কালকেতুকে বলেছে —

"ফুলরা বলেন প্রভু কহিব তোমারে।/ বাল্মীক পুরাণ কথা রচিল মুণিবরে।।
রাম না জন্মিতে ছিল যাটি সহস্র বৎসর।/ পুরাণ রচিল মুনি মধুর অক্ষর।।
আপনে জন্মিল বিষ্ণু দশরথের ঘরে।/ চারি অংশে জন্মিলেন চারি সহদরে।।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কেকই মহারানী।/ তিন রানীর চারি পুত্র জেন দিনমনী।।
কৌশল্যার পুত্র হৈল প্রভু নারায়ণ।/ সুমিত্রার পুত্র দুই লক্ষন শত্রুঘন।।
ভরত নাম পুত্র হৈল কেকই রানীরে।/ জার দোষে বনবাসে গেল রঘুবরে।।
পিতার সত্য পালিতে প্রভু রাম আইল বন।/ সঙ্গেত জানকি আর অনুজ লক্ষন।।
বনবাসে জানকি হরিল দশাননে।/ সুগ্রীরের সনে জাইয়া করিল মিলনে।।

বানরগণ লৈয়া সাগরে হৈল পার।/ সবান্ধবে রাবণ রাজা করিল সংহার।।

নারীর কারণে রাবণ সবংশে মরিল।/ রাবণ রাজার কথা তোমাকে কহিল।।"[১১৮]

ফুল্লরার কথায় কালকেতু তাকে কঠোর সত্য করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কালকেতু দেবীর সমগ্র রূপ পরিদর্শন করে পরম ভক্তের ন্যায় মাটিতে লুটিয়ে তাকে প্রণাম করে। যাকে মাসী ও ফুল্লরা সতীন ভাবে তাকে কালকেতু প্রণাম করলে তারা মনে করে তাদের গৃহে কোন মহাজন উপস্থিত হয়েছে। সমাজে মহাজন শ্রেণীর প্রতি প্রজাকুলের পদানত হওয়ার বাস্তব সত্যটি কবির প্রত্যক্ষগোচর ছিল। তাই হয়তো ফুল্লরা কালকেতু দেবীর সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময় এই কথাটি বলেছে। কালকেতুর মধ্যে দেবীর স্বরূপটি যেমন সত্য ছিল তেমনি সমাজের উচ্চ-নিম্নশ্রেণীর কঠোর ভেদাভেদ নীতিটি সম্পর্কে সজাগ ছিল। সমাজে ব্যাধ জাতির স্থান ছিল সর্বনিম্নে এবং সমাজের কাছে সে দুর্নীতিগ্রস্ত রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। এরূপ নিম্নশ্রেণীর অচ্ছুত-অস্পৃশ্য গৃহে এক রাত অতিক্রম করলে সমাজের চোখে সে খারাপ তথা ঘৃণার পাত্রী হয়ে যাবে। সেই প্রসঙ্গে অত্যন্ত কৌশলে সমাজ সচেতনার উদ্দেশ্যে কবি রামায়ণে সীতার পুনর্বার বনবাস যাত্রার কথা তুলে ধরেছেন। সমাজের কঠোর নীতি রাজা রামচন্দ্রও মানতে বাধ্য হয়েছিল। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা সেখানে তুচ্ছ। রামায়ণের এই কঠোর সমাজনীতিকে কালকেতু দেবী চণ্ডীর সতীত্বহানীর সমান্তরাল করে তুলেছে। কাহিনী গ্রন্থনায় কবি লোকসমাজের এই চিরাচরিত ধারণা ও মান্যতাকে কালকেতু কর্তৃক দেবীকে বিতাড়নের কারণ স্বরূপ কাজে লাগিয়েছেন।

অতঃপর কবি কাহিনী গ্রন্থনায় চরিত্রকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। লোক সমাজের কাছে দেবী মাহাত্ম্য বলতে গিয়ে কাহিনী অনেকটা শিথিল হয়েছে। দেবী চণ্ডী কালকেতুর গৃহ ছাড়তে অস্বীকৃত হলে সে তাকে সূর্যসাক্ষী করে বাণ মারে। কিন্তু তাতে তার বাণ ব্যর্থ হলে কালকেতুর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে ঘা লাগে এবং তাকে দেবী বলে স্বীকার করতে তার মন দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। এমনকি, দেবী চণ্ডী তাকে ধনুক ছেড়ে দিতে বলে এবং তাকে স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করে। তার মত সাধারণ দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাছে সোনার অঙ্গুরীটি খাঁটি কিনা সন্দেহ করা এবং হতবাকের কারণও বটে। কিন্তু ফুল্লরা কালকেতুকে মায়া দুর্গার ধন নিতে বারণ করে। ফুল্লরা কালকেতুকে বলে — "কি বুঝিয়া লইবে প্রভু মায়া দুর্গার ধন।।"[১১৯] এই মায়া দেবীর শক্তি। স্যার জন উড্রফ বলেছেন — "Maya, which achieves this, is one of the powers of the Mother or Devi ."[১২০] সাধারণ ব্যাধ দম্পতির দেবীর প্রতি অবিশ্বাস করা স্বাভাবিক। তার প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর জন্য দেবীর ভয়ঙ্কর শক্তি রূপের প্রকাশ অংশটির প্রয়োজন হয়। দেবী কালিকাই মানুষের দুঃখ নিস্তারের একমাত্র উপায়। সেকথা জানাতে এবং শ্রোতাদের নব প্রতিষ্ঠিত দেবীর শক্তির প্রতি আশ্বাস জন্মানোর জন্য বার বার কাহিনীতে তার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডীর সেই

স্বরূপে কালীর মিশ্রিত রূপটিকেই কবি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন — ‘‘পার্বতী, উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ-তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটি ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা কালিকাই বাঙলাদেশের শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন।’’[১২১] দুর্গার কালী স্বরূপা তন্ত্রের রূপটি কবি এখানে প্রকট করে তুলেছেন। তার বিকট মূর্তি দর্শনে কালকেতু ও ফুল্লরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। দেবী তাদের মাতৃসুলভ কোলে তুলে নেয়। দুর্গার উগ্রমূর্তির সঙ্গে স্নেহময়ী মাতৃকারূপটিও এখানে স্পষ্ট। তার রূপের মধ্যে তন্ত্রের পুরুষ প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে সেকথাও দেবী কালকেতুকে বলেছেন।

‘‘আমি পুরুষ প্রকৃতি বটি কহিলাঙ তোমারে।
গোপ্ত কথা আর জানি পুছহ আমারে।।’’[১২২]

সর্বোপরি শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন — ‘‘প্রথমতঃ, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ, তন্ত্রের ‘বিপরীতরতাতুরা’ তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ, নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবের পরাজয়ে বলরূপিনী শক্তিদেবীর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া; অসুরনিধন করিয়া অসুরগণের শব তিনি পদদলিত করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবারূঢ়া বলিয়া বর্ণিতা।’’[১২৩] দেবীর মাতৃতন্ত্র সম্পর্কে প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্রের শক্তির কথা বলেছেন। তাঁর কথায় — “Shakti (Kali) of the Shakti Cult is the Mother or the supreme being.”[১২৪] কাহিনী গ্রন্থনায় কবি দেবীর ধনপ্রদান বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বহুস্থানে দেবীর স্বরূপ অধিক পরিমাণে জোর দিয়েছেন। তার দ্বারাই কালকেতুকে দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা চলেছে। তাতে কাহিনীতে দেবী চণ্ডীই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এবং কাহিনীর গতি হয়েছে মন্থর।

দেবী চণ্ডী কর্তৃক ধন দানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনী গ্রন্থনা শিথিল হয়েছে। কাহিনীকে আরও জটিল করে তুলতে এসেছে দুটি চরিত্র। যদিও তাদের আগমনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সঙ্গত। সেক্ষেত্রে প্রথমে কালকেতু ও ফুল্লরা দেবীর ধন গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। এই অসম্মতির কারণের পিছনে সমাজের কয়েকটি নীতি কথা উঠে এসেছে। ফুল্লরা বলেছে যে, নিঃস্বরাই সর্বকালে সুখী। এই চিরন্তন সত্যকে কবি প্রচারের ঢঙে বলেছেন এইভাবে —

‘‘জার ঘরে ধন আছে তার শুন কথা।
মধ্য পাথারে তার ডাকাইতে ভাঙ্গে মাথা।।

ধন নাঞিঙ জন নাঞিঙ কি করিব গারি।

আনন্দে দুইজনে বঞ্চিব কোলাকুলি।।”[১২৫]

কালকেতুর মত সাধারণ রোজ খেটে খাওয়া মানুষের প্রচুর অর্থ দেখলে ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ দ্বারা ঠকবার এবং রাজা কর্তৃক অভিযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া সকলের চক্ষুশূল হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এই ধারণা কালকেতুর মত ব্যাধ সমাজের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং তা চূড়ান্ত সমাজ সত্য। কিন্তু দেবী চণ্ডী এই চরম সত্যের বিপরীতে অপর একটি দৃঢ় সত্যকে তুলে ধরেছেন। সেটি হল ধন-সম্পদই সকল শক্তির মূল কারণ। এর দ্বারাই দেবী তাকে সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার তথা ‘ঠাকুরালি’ করতে বলেছে। এই রকম সামাজিক সত্যকে কবি চরিত্রের ভাবনায় সন্নিবেশ করায় কাহিনী গ্রন্থনা একটু জটিল হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত কালকেতু দেবীর কাছ থেকে হাতে কঙ্কণ চেয়ে নেয়। ডালিম্ব গাছের গোড়া থেকে এক ঘট ধন উত্তোলন করার জন্য কঙ্কণ বদলে খন্তা ও কোদাল আনতে কালকেতু গৃহস্থ মণ্ডল বা মোড়লের কাছে উপস্থিত হয়। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে দুটি চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই গৃহস্থের কাছে কালকেতু দেবী প্রদত্ত কঙ্কণ নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তার ধারণাতীত মূল্যের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই গৃহস্থ মণ্ডল কঙ্কণের মূল্য বুঝতে না পারলে কালকেতু পুরাই দত্ত নামে বাণিয়ার কাছে উপস্থিত হয়। সে কঙ্কণের মধ্যে ধর্ম নিরঞ্জনের নাম দেখে শিরে ঠেকিয়ে নেয়। এই কঙ্কণ বিক্রি করার মধ্যে আদি দেবতা ধর্মের বাতাবরণকে ফলপ্রসু করা হয়েছে। ফলে সে ধর্মের নাম দেখেই তা সাগ্রহে গ্রহণ করে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় কালকেতুর এরূপ কঙ্কণ নিয়ে গৃহস্থ মণ্ডল ও পুরাই দত্ত নামক বাণিয়ার কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গটি কাহিনীতে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছে। সেই সঙ্গে উভয়ের কাছে কালকেতুর যাওয়া ও বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ধর্মের বাতাবরণকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই জন্য বোধ হয় কবি কালকেতুর কঙ্কণ বিক্রি করার ক্ষেত্রে গৃহস্থ মণ্ডল ও পুরাই দত্ত নামে বাণিয়া এই দুইটি চরিত্র অবতারণা করেছেন।

দেবী কর্তৃক কঙ্কণ প্রদানের পর কাহিনীতে এসেছে দেবীর শতনাম প্রসঙ্গটি। এটি কাহিনী ধারার সঙ্গে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে কবি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। কালকেতু কঙ্কণ লাভ করেও দেবীর স্বরূপ ও শতনাম শুনে তার প্রতি প্রবোধ জ্ঞান করতে চেয়েছে। সেখানে দেবী তার শতনামের মধ্যে যেসকল নাম উল্লেখ করেছে সেগুলি হল ক্রমান্বয়ে — চণ্ডিকা, চর্চ্চিকা, চামুণ্ডা, কালিকা, চণ্ডবতী, মহামায়া, শুভা, শুভঙ্করী, ইন্দ্রানী, ব্রহ্মাণী, নারসিংহী, কৌমারী, শক্তিরূপিনী, জয়ঙ্করী, জয়া, শঙ্করী, অভয়া, বেদবতী, নারায়ণী, কালি, কপালিনী, কৌশিকী, কামিনী, বৈষ্ণবী, শিব বণিতা, গৌরী, শাকম্ভরী, গঙ্গা, সুরেশ্বরী, আদি দেবী, গোমতী, সতী, জয়ন্তী, ভয়ঙ্করী, ভীমা, উগ্র, চণ্ডা, উমা, মহাতেজা, জমুনা, জোগিনী, যশোদা নন্দিনী, যোগনিদ্রা, জয়প্রদা, মৃড়ানী, অম্বিকা,

প্রচণ্ড কালিকা, শিবা, বিজয়া, পার্ব্বতী, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিশালাক্ষী, খড়্গিনী, শূলিনী, খেটক ধারিণী, দাক্ষী, কার্তিকী, কামরূপিনী, খগেশ্বরী, চণ্ডী, জলেশ্বরী, জয়দূতী, তপস্বিনী, জক্ষিনী, ত্রিপুটা, ত্রিনেত্রা, সঙ্কটা, শতভূজা, দ্বারবাসিনী, গদিনী, চক্রিণী, পিঙ্গলা, মোহিনী, সাবিত্রী, যোগরূপিনী, সরস্বতী, কামক্ষ্যা, কিরাতী, চণ্ডমুণ্ডা, চতুর্ভূর্জা, আদ্যা, কালরাত্রি, সর্বানী, সহস্রাক্ষী, শতভূজা, অপর্ণা, বামাক্ষী, সুবেশা, প্রত্যঙ্গী, শুভেশ্বরী, জগন্মাতা, শান্তি ইত্যাদি। এই সকল নামের উল্লেখ অধিকাংশ বেদ ও পুরাণে লক্ষ্য করা যায়। আর দেবী চণ্ডীর 'দ্বারবাসিনী' নামটি স্থানীয় মালদহ জেলার আঞ্চলিক নামের প্রত্যক্ষ প্রভাব জাত। প্রমাণ স্বরূপ ভবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর কথায় বলা যায় — "এই দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির গৌড়ের উপকণ্ঠে স্তূপাকারে এখনও বর্ত্তমান।"[১২৬] দেবী চণ্ডীর শতনামের উল্লেখ আমরা 'দেবীপুরাণ' গ্রন্থে লক্ষ্য করি। সেখানে দেবীর বিভিন্ন নাম এবং সেই নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা রয়েছে। তা এরূপ —

> "শিবা মূক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিণী
> শিবায় যো জপেদ্দেবী শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা
> *　　　　*　　　　*
> সোমসূর্য্যানিলাস্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি ভার্গব।
> তেন মা এ্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পবিকীর্ত্তিতা।।
> যোগাগ্নিনা তু যা দগ্ধা পূনর্জ্জাতা হিমালয়ে।
> পূর্ণসূর্য্যেন্দুবর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা।। ৭
> জলায়ানা নরা গৌর্য্যা সমুদ্রশয়নাথবা।
> নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারীং প্রকুর্ব্বতা।। ৮
> স্মরণাদিভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে।
> দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাৎ তেন দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা
> কং ব্রহ্মা কং শিবঃ প্রোক্রমশ্মসারঞ্চ কং মতম্
> ধারণাদ্বসনাদ্বাপি কাত্যায়নী মতা বুধৈঃ।।"[১২৭]

(অর্থাৎ, "শিব শব্দের অর্থ মুক্তি, দেবী যোগিগণের মোক্ষফল প্রদান করেন। শিবফলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা করা হয় বলে তার নাম শিবা। ... চন্দ্র, সূর্য্য, এবং বায়ু ইঁহারা দেবীর নেত্রত্রয়স্বরূপ, এইজন্য মুনিগণ তাঁহাকে ত্র্যম্বকা বলেন। দেবী যোগানলে স্বীয় তনু দগ্ধ করে পুনর্ব্বার হিমালয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণচন্দ্র সদৃশ গৌর দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম গৌরী। নার-শব্দে জল বুঝায়, এই জল দেবীর আশ্রয় কিংবা তিনি সমুদ্রশায়িনী, এরজন্য তাঁহার নাম নারায়ণী। স্মরণমাত্রেই দেবী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে দুর্গম শত্রুসঙ্কট-ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন

বলিয়া তাঁহার নাম দুর্গা। 'ক' শব্দে ব্রহ্মা এবং 'ক' শব্দে শিব; ইহাদিগকে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম কাত্যায়নী।")[১২৭] এছাড়াও এরই সঙ্গে এই গ্রন্থে দেবীর জয়ন্তী, অজিতা, বিজয়া, কালী, কপালিনী, কপালি, চামুণ্ডা, কৌশিকী, ভবানী, অপর্ণা, সাবিত্রী, ত্রিশূলী, শঙ্করী, ত্রিনয়না, ভগবতী, সর্বজ্ঞা, শান্তি, অপরূপা, শৈল-রাজ-সূতা, মাতৃকা, বেদমাতা, ব্রাহ্মণী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী ও ব্রজী ইত্যাদির নামের উল্লেখ রয়েছে। দেবী চণ্ডীর এই শত নামে শক্তিরূপিনী দিকটি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। তবে সেখানে দেবী চণ্ডীর সঙ্গে বৈদিক যুগের অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অরণ্যানীর সংযোগ ঘটেছে। কারণ দেবীর এই স্বরূপের সঙ্গে বর্তমান কালকেতুকে ধন প্রদান এবং অরণ্য পশুদের রক্ষার সম্বন্ধ রয়েছে। আর কালকেতু জীবিকায় পশুশিকারী এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির প্রতি তার নির্লোভই কাহিনীতে অরণ্যানী দেবীর সঙ্গে বিপরীত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। এই দেবীর সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলেছেন — "চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানের দেবী হলেন এই অরণ্য-চণ্ডী। পশুদের মাতা তিনি, কালকেতুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই তিনি ব্যাধের সন্তানকে রাজা করে দিয়েছিলেন।"[১২৮] কালকেতুর সঙ্গে দেবীর মনোবাঞ্ছার বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে —

"মৃত্তিকাতে ঘাও মারে ব্যাধের নন্দন।
খন্‌তার ঘায়ে কেতুর কপাল করে টনটন।।
কালকেতু বলে মোর ধনে নাই সাধ।
মৃগবধি মাংস বেচিয়া খাব ভাত।।"[১২৯]

অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনকে এই নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ চরিত্রটি হঠাৎ মেনে নিতে পারেনি। তবে কাহিনীর অনিবার্যতার কারণে কালকেতু দেবীর অনুরোধে খেজুর ও নারিকেল গাছের গোড়া থেকে সাত ঘড়া ধন উত্তোলন করে। সাত ঘড়া ধনের মধ্যে কালকেতু ছয় ঘড়া এবং দেবীকে এক ঘড়া দিয়েছে। যেই দেবী তাকে এই ধন প্রদান করল তখন কালকেতু তার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করল। কালকেতুর মত অতি নিম্নবিত্তের মানুষের পক্ষে এরূপ আচরণ নতুনত্বের নয়। ধন নিয়ে কালকেতু গৃহে পৌঁছায়। তারপর কাহিনীতে ধনপূজার অভিনব ঘটনাটি এসেছে। কাহিনীধারায় ধন-পূজার ঘটনাটির বর্ণনা অতিরিক্ত অংশ বলে মনে হয়। কালকেতুর ভাঙা ঘরে ধন পূজা দ্বারা তা স্থায়ীকরণে অস্বাভাবিকতা ও অলৌকিকতার প্রভাব রয়েছে।

আখেটিক খণ্ডে এরূপ ধনপূজার লৌকিক বিশ্বাস ও আচরণের ঘটনা কাহিনী গ্রন্থনায় নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। দেবী চণ্ডীর দুর্গা চামুণ্ডা স্বরূপের সঙ্গে এখানে লক্ষ্মী দেবী ভাবনা যুক্ত হয়ে গেছে। তবে কবি বিভিন্ন তথ্য প্রদান করলেও কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে তা শিথিলতা গ্রাস করেছে। এছাড়া কালকেতু তার ধন নিয়ে গুজরাট নগর পত্তন করবে কিনা সে বিষয়ে কোন সদুত্তর

কাহিনীতে পাওয়া যায় না। বরং কালকেতুর মত সামাজিক পরিচয়ে নিম্নস্তরের ব্যাধ জাতির কাছে অকস্মাৎ বহু ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে ওঠা রাজদণ্ডের কারণ হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। রাজতন্ত্রে রাজাই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রজা তার অধীনস্ত। সেই প্রজা যদি অর্থে রাজা সম হয় তাহলে ক্ষমতাবান রাজা তাকে দুষ্কৃতির অভিযোগে দণ্ড বিধান করবে। তাই কালকেতু দেবীকে বলে —

"ধনের কার্য্য নাঞি কহিলাঙ তোমারে।
ধনবান হইলে রাজাএ দণ্ড করে।।"[১৩০]

সমাজে এরূপ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন অভিজ্ঞতার আভাস দিয়েই কবি মানিক দত্ত এই দণ্ড বিধান থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ দেবী চণ্ডীর ব্রতের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই ব্রতের নিয়ম ও মঙ্গলবাণী ধ্বনিত হয়েছে।

"শুন বাছা কালকেতু শুন মোর বানী।
জে নাম স্মরিলে বাছা আসিব আপুনি।।
অরন্যে প্রান্তরে আর মর্থভুবনে।
দৈত্যে বেড়িয়া থাকে সংকট জে স্থানে।।
সে সব সংকটে আমি রাখিএ সকল।
জদি একচিত্ত ভাবে শুনে আমার মঙ্গল।।
রাইহ হইয়া শুনে যদি আমার মঙ্গলব্রত।
যুগে২ থাকেন তাহার রাইহত।।
বিধবা হইয়া শুনে আমার মঙ্গল।
অন্তঃকালে দেই তাকে রাঙ্গা পদে স্থল।।
শুন বাছা কালকেতু মোর হিতুবানী।
নিজ নামে স্মরিলে বাছা আসিব আপনি।।"[১৩১]

এই মঙ্গলব্রতের পাশাপাশি কাব্যে ধন বিক্রি করার কথা প্রসঙ্গে পুরাই দত্তের নাম উল্লেখ থাকলেও তার সঠিক ব্যাখ্যা কবি এড়িয়ে গেছেন। বরং সেইস্থানে মঙ্গলচণ্ডীর পশুবলি দিয়ে শনি-মঙ্গলবারে পূজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দেবী চণ্ডীর শক্তি স্বরূপটি অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। দেবী পশুবলী দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। তার পূজা হয় শনি ও মঙ্গলবারে। প্রসঙ্গত, দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছে— "উগ্র মার্তৃ-মূর্ত্তির ন্যায় মঙ্গলবার এই দেবীর প্রিয় বার।"[১৩২] মধ্যযুগে মানুষের উর্দ্ধে দেবতার স্থান — এরও পরিচয় পাই কালকেতুর উদ্দেশ্যে দেবী চণ্ডীর উক্তিতে। দেবী চণ্ডী কালকেতুকে বলে —

"তোমার কুড়িয়াতে আমার পদভর।

ইহার উপরে বান্দিহ দিব্য আমার পূজার ঘর।।''[১৩৩]

এভাবে কবি মানিক দত্ত কালকেতুর ধন প্রাপ্তি এবং গুজরাট নগর স্থাপনের পূর্বে কয়েকটি আনুষাঙ্গিক সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবনার উন্মোচন ঘটিয়েছেন। এই সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলি কাহিনীকে ধীর করেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শৈল্পিক লক্ষ্যের থেকে একটু বেরিয়ে উপলক্ষ্যকে বড় করে তোলা হয়েছে। তবু সেই উপলক্ষ্যগুলিও মধ্যযুগের বিশিষ্ট ভাবনার পরিচায়ক।

এরপরে কাহিনীতে আসে গুজরাট নগর পত্তনের ঘটনা। গুজরাট নগর পত্তন ঘটনাটি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অকস্মাৎ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে গুজরাট নগর পত্তনের কোন স্পষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। দেবী চণ্ডী কালকেতুকে ধনপ্রদান করে নগর পত্তনের কথা উল্লেখ করেনি। উপরন্তু গুজরাট নগর পত্তনের সময় দেবীর সহায়তার জন্য যে অসুবিধার কারণ উপস্থাপনা হয়েছে তাও স্বাভাবিক জনজীবনের সঙ্গে অটুট সম্পৃক্ত নয়। কবি কালকেতুকে দেবীর দ্বারস্থ হওয়ার কারণ স্বরূপ বাঘের ভয়ে এক ঘোড়া খাদে পড়ে যাওয়া এবং তার সঙ্গে অন্য সকলেও পালিয়ে যাওয়াকে দেখিয়েছেন। তার ফলে চণ্ডীর আগমন ঘটে। দেবী চণ্ডীর চক্রবাণের অনলে সকল বন কেটে সাফ হয় এবং উচু-নিচু সমান করে গুজরাট নগর স্থাপিত হয়। সেখানে একশত বাড়ি স্থাপন করলেও কালকেতুর বাড়ি সবার উপরে। এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য চার দ্বারে চার জন দারোয়ান নিযুক্ত করে। কালকেতু গুজরাট নগরের রাজা হলে সেখানে পুরীর ভিতর দেবীর দোহরা নির্মাণ করে। দোহরা তৈরী করে পূজার বর্ণনায় তন্ত্রশাস্ত্রের নিয়মাবলীর প্রভাব রয়েছে। কালকেতু পশুবলি দিয়ে শনি-মঙ্গল বারে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করা হয়েছে। তার আগে সে ভূত সুদ্ধি ও বিভিন্ন ন্যাস করে নেওয়া হয়। সাধারণত তন্ত্রশাস্ত্রে ঘট স্থাপন করে যে দেবী পূজার প্রধান অঙ্গ তাও এখানে লক্ষ করা যায়। এর কারণ সম্বন্ধে 'তন্ত্রকথা' গ্রন্থের রচয়িতা চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন — ''ইহার কারণ বোধ হয় ইহাদের মূর্তির ভীষণতা।''[১৩৪] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায় —

''বান্ধিল দেহরা ঘর পুরীর ভিতরে।
বলি দিয়া করে পূজা শনি মঙ্গল বারে।।
*　　　　*　　　　*
উত্তর মুখে স্থাপিল দুর্গার ঘট বারা।
মণিমুক্ত দিয়া কনকে বান্ধে ঝারা।।
ধূপদীপ দিয়া করিল অন্ধকার।
কাএ মনে ভবানীক লাগিল পূজিবার।।
বীজ মন্ত্র জপিয়া ঘটতে দিল জল।

সেই সময় য়াইল দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল।।”[১৩৫]

লক্ষণীয় তন্ত্রশাস্ত্রে দেবী পূজার একটি উপায় হল মন্ত্র। ‘মন্ত্র’ শব্দের অর্থ হল ‘মননাৎ ত্রায়তে’ অর্থাৎ যে বস্তু মনন করতে করতে ত্রাণ পাওয়া যায়। মন্ত্রতন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তন্ত্র মতে প্রত্যেকেরই ইষ্টদেবতার বীজ মন্ত্র রয়েছে। এই বীজ মন্ত্রের দ্বারাই কালকেতু দেবী চণ্ডীকে সহজে পেল। এরূপ দেবী চণ্ডীকে কালকেতুর স্মরণ করার কারণ —

“চারি রাজ্যের প্রজা দুর্গাকে করএ ভজন।

তব না ভরিল গুঞ্জুরার এককোন।।”[১৩৬]

এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষকে আস্বস্ত করার জন্য শক্তিদেবীর প্রয়োজন ছিল। সেই পরিস্থিতির অনুকূল করেই কবি কাহিনীতে শক্তিরূপিনী চণ্ডীকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সেজন্য কবি এখানে দেবী পূজায় শক্তিরূপিনী চণ্ডীর পূজায় তন্ত্রশাস্ত্রের কথা এনেছেন। কাহিনী ধারা এখানে তন্ত্রশাস্ত্রের পূজা পদ্ধতির দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত।

এরপর কাহিনীতে নতুন নতুন ঘটনা ও চরিত্রের বহু সমাবেশ ঘটেছে। আর কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙ্গার থেকে কাহিনীতে দ্বান্দ্বিক পরিবেশের সূচনা হয়। সেক্ষেত্রে দেবী চণ্ডী কর্তৃক গুজরাট নগরে বসতি স্থাপনের উপায় বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডীর গুজরাট নগরে বসতি স্থাপনের জন্য উপায় বের করতে নারদ চরিত্রকে আনয়ণ করা হয়। নারদই কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙ্গার বুদ্ধি দেয়। দেবী চণ্ডী প্রথমে এই কার্যে কলিঙ্গের চার মণ্ডলকে তার ব্রতের মঙ্গল এবং শক্তিরূপিনী রূপের কথা স্বপ্নে বলে। প্রভাতের স্বপ্ন সত্য — এই লোক বিশ্বাসে তারা চারজন কলিঙ্গের সকলকে নিয়ে পালিয়ে যেতে রওনা দেয়। তারা জানে সম্পদ ও ঐশ্বর্য সমাজে শক্তির মূল প্রাণকেন্দ্র। মধ্যযুগের সাহিত্যের গবেষক আহমদ শরীফ-এর কথা প্রসঙ্গত মনে আসে — “মঙ্গলকাব্যগুলো বাঙালী হিন্দুর মন-মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন। অর্থই হচ্ছে শক্তির উৎস, ধন যার আছে মান তারই।”[১৩৭] দেবী চণ্ডী কলিঙ্গের মণ্ডলদের গুজরাট নগরে পাঠানোর জন্য অলৌকিক স্বপ্ন, পার্থিব চিন্তা, পরকাল ভাবনা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লোক বিশ্বাস ও তন্ত্রের শক্তি দেবীর স্বরূপটিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর ফলে কাহিনীতে ঘটনার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। সে যাইহোক, কালকেতুর জন্ম থেকে কলিঙ্গ ভাঙন পর্যন্ত কাহিনীর আদিপর্ব।

আর কাহিনীর মধ্য পর্বের সূচনা হয় ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে চণ্ডীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। চার মণ্ডলের পর মঙ্গলকাব্যের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তথা পুরাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ভাঁড়ু দত্তের কথায় তার উদ্ভব। সেখান থেকেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্যে Climax-এর সূত্রপাত। ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গ রাজ্যে অন্যান্য মণ্ডলদের মধ্যে তার সামাজিক অবস্থান সর্বোচ্চ।

“শুনিয়া ভাড়ুর বানী   চারি মণ্ডল মনে গুনি

হৃদয়ে জপিছে নারায়নী।

দুষ্ট ভাডুয়া বেটা বাদে লাগিল মাতা ঠেটা

উদ্ধার কর মাতা নম নারায়নী।।"[১৩৮]

কারণ, ভাঁড়ু দত্ত প্রতিষ্ঠিত কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙ্গে নব প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠা করতে নারাজ। তাতে চণ্ডীর সম্পূর্ণ ব্রত প্রচারের উদ্দেশ্য অসমাপ্ত থাকবে। তাই ভাঁড়ু দত্তের মত অসামাজিক ও সমাজ বিরোধী চরিত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেবী চণ্ডীর স্বর্গপুরে ইন্দ্রের কাছে যাত্রা। ইন্দ্রপুরে যাত্রায় হিতোপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে চণ্ডীর সহচর হয়েছে নারদ। নারদ চরিত্রটি চণ্ডীর তথা কাহিনীর গতি প্রবাহকে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রভাবিত করেছে। লক্ষণীয় যে, ইন্দ্রের সভায় নিম্নশ্রেণীর দেবী চণ্ডীকে অদ্ভুত সমাদরের সঙ্গে আতিথেয়তায় বরণ করছে।

"শচীর মাথে দিয়া ইন্দ্র আগর চন্দন।

চাম্পার ফুলের মালা পরিষদগণ।।

মাথে করি নিল ইন্দ্র দিব্য সিংহাসন।

সমুখে আসন থুইয়া বন্দিল চরণ।।"[১৩৯]

মঙ্গলকাব্যে তথা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় এই বিনয়ের দিকটি কবি তুলে ধরেছেন। দুই সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব নয়; বিপদে উভয়ের মধ্যে মানবিক সম্বন্ধই এর মূল কথা। মধ্যযুগের প্রাজ্ঞ গবেষক অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন — "সম্ভবত, প্রথমে অলীক অলৌকিক দেবদেবী পরিকল্পনা, পরে মিশ্রিত অলৌকিক-মানবিক জগতের বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে মানুষের মন ও দৃষ্টি বিশুদ্ধ মানবিক জগতে নিবদ্ধ হয়। ... এই ইতিহাস মানুষেরই আত্মচেতনার বিকাশের ইতিহাস। আত্মচেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাব্য ধীরে ধীরে পৌরাণিক ও দেবদেবীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পার্থিব মানবিক জীবনকে সৃষ্টি করে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের মানবায়িত দেবদেবীর কাহিনীর মধ্যে মানুষের বর্দ্ধিষ্ণু আত্মচেতনার স্বাক্ষর বর্তমান।"[১৪০] তাই দেবীর মুখে সমস্ত ঘটনা শোনার পর ইন্দ্র আট জন মেঘকে ডাকল। তার ফলশ্রুতিতে আট প্রকার মেঘের শক্তি মহিমা ও কথন ভঙ্গিতে রূপকথার প্রকাশ পেয়েছে। সেই আট প্রকার মেঘের নাম হল — হুরুকা, দুরূকা, আবর্ত, সামর্ত, কালাপাহাড়, আন্ধারিয়া, কালিয়া ও সিন্দুরিয়া ইত্যাদি। কথনভঙ্গি, অতি শক্তিমহিমা ও তোষামদ লক্ষ্য করে চণ্ডী অন্তরে তাদের অক্ষমতার অনুভব করে এবং হেসে 'নাল মাহিনা' * বা চাষের জমি বেতন স্বরূপ ভোগ করার অভিযোগ শোনায়। অতঃপর দুই জন মেঘ ছাড়াও দেবী চণ্ডী

*এই চাষের জমি বেতন স্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা সুলতান আমলে (১২০৬—১৫২৬) 'ইক্তা' ব্যবস্থায় প্রচলন ছিল। মুঘল আমলে তা 'মনসবদারি' ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়। তার বর্ণনা এইরূপ— "The jagirdars were usually mansabdars, holding ranks (mansabs) bestowed upon them by the emperor. These ranks were generally dual, viz. zat and sawar, ... The pay scales for both ranks were minutely laid down, and the manasabdars received their emoluments either in cash (naqd) from the treasury, or, as was more common, were

assigned particular areas as - jagirs."—Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India (1556-1707), Oxford University Press, Second Revised Edition, 1999, P. 299-300.

পবন নন্দন বীর ও শক্তিশালী হনুমানকে দিয়ে সমগ্র কলিঙ্গ রাজ্যকে পাখার মত ঘুরায়। অন্যদিকে, ভাঁড়ুকে বিড়ম্বনা করার জন্য চারিদিকে জলকীর্ণ করে দেয়। ভাঁড়ু দত্ত তখন তার ইষ্ট দেবতা শিবের প্রতি অনাস্থা ও ইন্দ্রের প্রতি ভরসা হারায়। তবু সে দুর্গার মত নতুন দেবীর বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত হয়। ভাঁড়ুর মধ্য দিয়ে পুরাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দুর্বলতা ও উদাসীন শিবের প্রতি অনাস্থা এবং নতুন দেবী চণ্ডীর প্রতি ফল্গুধারার মত কিঞ্চিৎ আসক্তির আভাস পাওয়া যায়। অরবিন্দ পোদ্দার-এর কথা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য — "মানুষের মধ্যে জীবনকে ঘোষণা করার, প্রতিকূল পরিবেশের দুর্দৈব থেকে আত্মরক্ষা করার, যে সহজ প্রবৃত্তি আছে তা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় জীবনদর্শন ও আরাধ্য দেবতা তার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনই আঘাতের স্পর্শে সৃষ্ট নতুন ব্যক্তিসত্তার অন্ত-বিরোধ দেখা দেয়; মানুষের নিজস্ব সত্তা যেন বিরোধী দুটো সত্তায় বিভক্ত হয়ে যায় — এক, তার পুরাতন ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ; দুই, সৃষ্টি চেতনায় উন্মুখ নতুন। এই দু'য়ের সংঘাত থেকেই নতুন ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাব। এই সংঘাতে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-না-খাওয়া পুরাতন আদর্শ আপনাকে বাঁচাতে পারে না; মধ্যযুগের ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় শিব তাই বেমানান।"[১৪১] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর বিড়ম্বনায় ভাঁড়ু দত্তের এরূপ মনোভাবনার পরিচয় স্বাভাবিক। অতঃপর শিব পূজক ভাঁড়ু দত্তকে উপযুক্ত শায়েস্তা করতে ব্যর্থ হয়ে চণ্ডী তার সতীন তথা শিবের স্ত্রী গঙ্গার কাছে সাহায্যের জন্য দ্বারস্থ হয়। ভাঁড়ু দত্তের অপরাজয়কে সামনে রেখে কবি চণ্ডী ও গঙ্গার মধ্যে সতীন ভাবনা জনিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করার অবকাশ পেয়েছেন। তাই গঙ্গা তাকে সাহায্য করতে অসম্মত হলে চণ্ডী ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রের কথায় গঙ্গার পুত্র ডাক ও ডেউরের কাছে আসে। ভাঁড়ু দত্তকে শায়েস্তা করতে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা ও ব্যর্থতা বর্ণনায় কাহিনী অনেক জটিল হয়েছে।

এরপরই আসে কাহিনী গ্রন্থনায় বাস্তবতার ছোঁয়া। তাতে দেবী চণ্ডীর ডাক ও ডেউরের পুরীতে যাত্রা এবং তাদের আপ্যায়ন বাস্তবপ্রসূত। তাদের দ্বারা ভাঁড়ুকে বিড়ম্বনা করার পূর্বে দেবীর কলিঙ্গের অন্যান্য প্রজার প্রতি বাৎসল্যরসাসিক্ত রূপ ঝরে পড়ে, তাই সে কলিঙ্গের অন্যান্য প্রজাদের প্রেরণ করে। তারপর চারি প্রকার বন্যার দ্বারা কলিঙ্গ ভাসিয়ে দেয়। তাতে ছত্রিশ জাতির কলিঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার কথা পাওয়া যায়। তা অত্যন্ত বর্ণনাবহুল নয়। তবে তার মাঝেই সমাজের বয়োবৃদ্ধদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা ধরা পড়েছে। তারা কখন আশ্বিন মাসে বন্যা দেখে নি। বন্যার আগমনে ধান ডুবে যাওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত; ছোট-বড় বাড়ি ভেঙ্গে যাওয়া, মোদকের মুদির দোকান, কাপাসের কাগজ ভেসে যাওয়া, ঘরের গৃহপালিত পশু, তৈজস পত্র ভেসে যাওয়া এবং সেই অকস্মাৎ বিপদে 'কারো সর্বনাশ কারো ভাদ্র মাস'। কবি মানিক

দত্তের এই বর্ণনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত এবং তা সহজসরল ও বর্ণনাবহুল রূপ ধরা পড়েছে। তবে সেই বর্ণনা কাহিনীর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হলেও বাস্তবতা ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ নিখাদ সত্য। লৌকিক জীবনে এরূপ সত্য চিত্রের এক ঝলক কবি এখানে সংযোজন করেছেন।

অতঃপর ভাঁড়ুর অবস্থার উপর পাঠকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। ভাঁড়ু প্রবল পরাক্রমে দেবীর সঙ্গে লড়ে গেছে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সে যথেষ্ট আত্মশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে। আত্মশক্তি জাগিয়েছে তার পুরাতন ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদার প্রেরণা থেকে। কিন্তু কাহিনীর অনিবার্য রথচক্রে তাকে দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতে হয়। লক্ষণীয়, ভাঁড়ু দত্ত একাই দেবী চণ্ডীর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়নি; তার সঙ্গে ছিল তার গোষ্ঠী। কবি তা বর্ণনা করেছেন এই ভাবে —

"মাটি ভাঙ্গিয়া বেটা উগার বান্ধিল।
সগোষ্ঠি সহিতে ভাড়ু উগারে চড়িল।।
ধীরে২ গেল বন্যা উগারের তরে।
টুই ফাড়ি দিয়া বন্যা উঠিলেন চালে।।
চালে চড়িয়া ভাড়ু চারিদিগে চাএ।
ভাড়ু বলে আমার বৈরী হৈল মহামায়ে।।
জেই দিগে ভাড়ু চাহে সেই দিগে বাণ।
ভাড়ু বলে মহামাএগ রাখহ পরাণ।।"[১৪২]

সম্ভবত, ভাঁড়ুর এই পরাজয়ের পিছনে পরিবারের স্নেহ ও দায়িত্ববোধ সক্রিয় ছিল। সম্মুখ বিপদ থেকে বাঁচার তাগিদে ভাঁড়ু দেবী চণ্ডীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলে দেবীও তাকে সহ সগোষ্ঠীকে বাঁচাবার জন্য ভেলা এগিয়ে দেয়। কারণ ভাঁড়ু মারা গেলে তার ব্রত পূর্ণ হবে না। তাই দেবী চণ্ডী তার মত ঠগঠামন বা প্রতারককে রক্ষা করল। এখানে দেবী চণ্ডীর চরম ভক্ত-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিত স্বভাবই তার কারণ। যে কিনা শত্রু বা প্রতিবাদীকে চরম বিপদে ফেলতে পারে, আবার তার প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থী হলে প্রাণরক্ষা করতেও এগিয়ে আসতে দেরী হয়না। প্রসঙ্গত, অরবিন্দ পোদ্দার-এর মন্তব্য মনে পড়ে। তিনি বলেছেন — "শক্তি-কল্পনার মধ্যে মানুষের দুটো সহজাত প্রবৃত্তি পরিশোধিত রূপে প্রকাশ লাভ করেছে — একদিকে তাঁর বাঁচার আকূতি, আত্মরক্ষার ও সেজন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের প্রেরণা; এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনের আকূতি। আর এই দুই প্রেরণার সংযুক্ত অভিপ্রকাশের ভিতর দিয়ে মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করেছে, প্রকাশ করেছে তার মনোগত ভাবকে যে সে মানুষ, এবং মানুষ হিসেবে তার জীবনের অব্যক্ত লক্ষ্য হলো নিজেকে উপলব্ধি করা।"[১৪৩] শেষ পর্যন্ত ভাঁড়ু দত্ত এই মানবিকতার খাতিরে দেবী চণ্ডীর নতুন রাজ্যে আগমনে বাধ্য হয়। আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি দৃঢ়বদ্ধ ভাঁড়ুর শক্তিরূপিনী দেবীর কাছে পরাজয়ই

বড় হয়ে ওঠে। ভাঁড়ু দত্তের এই পরাজয় কাহিনী গ্রন্থনায় মূল কেন্দ্রিয় উদ্দেশ্যের দিক থেকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

কাহিনী ধারার কালানুবৃত্তে ভাঁড়ু দত্ত কংশ নদীর তীরে সকল প্রজার সামনে উপস্থিত হয়। প্রজাদের জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত করার মনদুঃখকে লক্ষ্য করে সে সহানুভূতি প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্বন্ধে বলেছেন — "... মুকুন্দরামের গ্রন্থে এই migration বা দেশত্যাগের ব্যাপারটি এত সহজে সম্পন্ন হয় নাই।"[১৪৪] সমালোচকের এই মন্তব্য মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে খাটে না। সকল প্রজার উদ্দেশ্যে বলে — "মন ব্যথা দেখি কেন জত প্রজাগণ।।"[১৪৫] এই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান এবং তাদের সমর্থন পাওয়ার কৌশলী চরিত্র রূপে ভাঁড়ু দত্তকে এখানে সঠিক অঙ্কন করা হয়েছে। এধরনের চতুর চরিত্র আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতে সহসা লক্ষ্য করা যায়। কালকেতুর মত সহজ-সরল ব্যাধের কাছে ভাঁড়ুর মত বিচক্ষণের উদ্দেশ্য সাধন কাহিনীতে অসামঞ্জস্য বলে মনে হয় না।

এরপর কাহিনীতে প্রথানুসৃত গুজরাট নগরের বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বৃত্তির মানুষের বসতি স্থাপন বিষয়টি এসেছে। সেখানে প্রথমে কবি মুসলমানদের বসতির কথা বলেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর তথা মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের প্রতি আনুগত্যবশত এরূপ বর্ণনা অসম্ভবের কিছু নয়। মুসলমানদের মধ্যে মীর, পাঠান, উচ্চশ্রেণীর মানুষ ছাড়াও শেখ, কাজী, মোল্লা, ফকির প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ আছে। তার পাশাপাশি পাখি বিক্রেতা, বিভিন্ন জাতির ব্রাহ্মণ, নগরের মাঝে কায়স্থ ও বৈদ্য ইত্যাদি জাতি নিয়ে আশিটি ঘর এবং পশ্চিমে বাণিয়া, নগরের মাঝে কৈবর্ত্য, তেলি, মালী, কুমার, কামার, বারই, গোয়ালা, তৈলঙ্গা, মোদক, মাছুয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় কালকেতুর গুজরাট নগরে বসতির জন্য আসে। কবি প্রথমে ছত্রিশ জাতির নাম এবং তারপর তাদের জীবিকার কথা পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কালকেতুর গুজরাট নগরে বাণিয়া হাট, গোত্তাল হাট, তৈলঙ্গা, মোদকি, পুড়ি, মালী, তিয়র, কামার ও চাড়াল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হাটের কথা পাই। এই বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি ও ব্যবসায় বৃত্তির প্রতিনিধি এই নতুন শহরে বাস করিতে আসিল, তাহাদের মাধ্যমে ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সমাজ বিন্যাসের একটা অতি তথ্য সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক ছবি পাওয়া যায়।"[১৪৬] সেক্ষেত্রে কবি মানিক দত্তের বর্ণনা এরূপ —

"প্রথমে মোশলমানকে করিল মোশলমান।/ হাড়ি কারি বসিল মীর পাঠান।।

*　　　　*　　　　*

গাও দশ খোজা বৈসে এ মরা নগরে।/ কাজি মোল্বা জত সব বসিল থরে থরে।।

সেখ ফকির বৈসে গেল শানকি বোঝা২।/ এক সাথে বৈসে গেল আশি হাজার খোজা।।

পক্ষ বেচা বসিল সব থরে থর।/ এক দিগে বসি গেল মনের বাজার।।
ব্রাহ্মণ টোলা বসিল নগর মাঝারে।/ কত জাতি ব্রাহ্মণ বৈসে লেখা নাহি তারে।।
কাএস্ত বসিয়া গেল বৈদ্য আশি ঘর।/ পশ্চিমে বাণিয়া বৈসে লএ কৈতর।।
কৈবর্ত্ত বসি গেল নগর মাঝারে।/ গুড়ি পড়ি কুড়ি বসিল থরে২।।
তেলি মালী বসি গেল কুমার কামার।/ ছত্রিশ জাইত প্রজা বৈসে বীরের বাজার।।
আর জত বসিল লোক কি কহিব তরে।/ নগর মধ্যে হাট পড়ে শনি মঙ্গল বারে।।
প্রথমে কৈবর্ত্ত্য বৈসে বাজারে বেচে ধান।/ বারই ভাই বসিল তারা বেচে পান।।
বাণিয়া হাট বসি গেল অন্য২ পসার।/ গোওাল হাট বসি গেল মধুর বাজার।।
তৈলঙ্গা হাট বসি গেল বাজারে বেচে ভুণি।/ বীরের বাজারে বেচে ভোট কম্বল খানি।।
হস্তী ঘোড়া খরিদ হএ বীরের বাজারে।/ চারি রাজ্যের রাজা আইসে বানিজ্য করিবারে।।
মোদকি হাটা হালুই হাটা খাজা কাটে জারা।/ পুড়ি হাটা কুড়ি হাটা খিড়া বেচে তারা।।
কামার হাটা বসি গেল কোদালি ফাল গড়ে।/ হাড়ি পাতিল বেচে কুমারের বাজারে।।
মালী হাটা বসি গেল তারা বেচে ফুল।/ সেথনি বঙ্গদেশে ধরে ধম্মতুল।।
তিয়র হাট বসি গেল বাজারে বেচে ছাচ।/ চাড়াল হাটা মাছুয়া হাটা বাজারে বেচে মাছ।।"[১৪৭]

আর্য রাজা সুরথের বিরুদ্ধে সমাজে পীড়িত অনার্য দেবী চণ্ডী ও তার অনার্য ভক্ত কালকেতুর ভিন্ন কল্পনার রাজ্য গুজরাট নগর পত্তন একপ্রকার সর্বধর্ম সমন্বয়ের ফলস্বরূপ। তবে প্রায় সব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই একই বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে কবি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটাতে পারেন নি। তবে তার রাজ্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল — এই বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রসারের এই তথ্য আমাদের অভিভূত করে। মধ্যযুগে বাণিজ্য ব্যবস্থার সুন্দর আভাস তাঁর কাব্যে পাই। এমন কি, তিনি গুজরাট নগরে বসবাসকারি সকল প্রজার জন্য অট্টালিকা তৈরী করা, খলিফাদের চাঁদা তোলার কঠোর নীতি উচ্ছেদ করা, তুরঙ্গে গিয়ে সকলের ভালো-মন্দ তদারকি করা ও দরিদ্রের অর্থপ্রদান করা ইত্যাদি সমকালীন মানুষের সহানুভূতি অর্জনকারী বিষয়কে এখানে তুলে ধরেছেন। কবি এরূপ প্রজা বৎসল আদর্শ রাজার কথা সমাজের কাছে তথা সমকালের শ্রোতা-পাঠকের সম্মুখে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। অনার্য ব্যাধ কালকেতুর মহৎ ভাবনার কথা প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার-এর মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে — "এই সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বা আর্য ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বিরুদ্ধে অনার্য ভাবধারার বিজয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাঙ্গালী ভাব-মুক্তি অর্জন করে। এই মুক্তি তার একান্তই কাম্য ছিল; বিবদমান সাংসারিক বিধিব্যবস্থার এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভবত সে এই পথেই অর্জন করতে চেয়েছে। বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয়ের সাহায্যে তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নতুনভাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে; সে সকলকেই গ্রহণ করল,

কাউকেই অনাদরে দূরে ঠেলে দিল না। কালকেতুর আদর্শ রাজ্য স্থাপনের মধ্যে সকলকে গ্রহণ করার মনোভংগীর স্বাক্ষর রয়েছে। সেখানে বসবাসের জন্য ব্রাহ্মণরা আসছেন, কায়স্থরা আসছেন, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-গোপ-ধীবর প্রভৃতিরা আসছেন, মুসলমানরাও আসছেন। সবাই সেই রাজত্বে চণ্ডীর কৃপা লাভ করে' সুখশান্তি সমৃদ্ধিতে জীবন নির্বাহ করতে পারে। ... তাই একটা নির্দিষ্ট স্বার্থ ও উদ্দেশ্য মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে থাকলেও এর মধ্য দিয়ে একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে।"[১৪৮] কালকেতুর গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানবিক সমন্বয় থাকলেও তা হিন্দু সংস্কৃতি বা পুরাণ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কালকেতু বিষ্ণুর নাম করে যজ্ঞে একশত ব্রাহ্মণ প্রদান করে। অনার্য ব্যাধ কালকেতুর ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের এই সংস্কৃতির প্রতি সমাদর উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। তবে কবির বিভিন্ন জাতি ও ব্যবসায় বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর কথা আলোকপাত অংশটি বিস্তৃত ও তথ্যবহুল হলেও সুগ্রন্থিত নয়।

এরপর ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা কাহিনীতে আবশ্যক হয়ে ওঠে। সেই কারণে কাহিনী গ্রন্থনায় গুজরাট নগরে অবস্থিত হাটের পটভূমি এসেছে। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর নতুন প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরের আশাতীত সুব্যবস্থা, পরিকল্পনা ও সুযোগ-সুবিধা লক্ষ্য করে ঈর্ষান্বিত হয়। কাহিনীতে ভাঁড়ুর এই রূপ আচরণ অস্বাভাবিক নয়। তার মত দুষ্ট বা 'নাবড়' প্রকৃতির চরিত্রই রাজা কালকেতুকে রাজ্য শাসনের বিষয়ে সচেতন করে দিতে চেষ্টা করে। অতঃপর সে সাতপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শাক, দুধ ও মাছ ওয়ালার কাছে তোলা বা আয়কর তুলতে যায়। তাতে প্রজাদের প্রতি ভাঁড়ু দত্তের বিরূপ আচরণে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কয়েকটি দিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার দ্বারা শাকওয়ালার তিন কাঠা জমির জন্য নয় 'তঙ্কা' বা টাকা কর, দুধ ওয়ালার গৃহে নয় জন মানুষের ও বহু গরুর পরিসংখ্যানের উপর শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। কবি এই অর্থনৈতিক অবস্থার সুন্দর তথ্য প্রদান করেছেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভাঁড়ু দত্তের শোষণ নীতির বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তা সমাজ অভিজ্ঞতার দলিল। এই অর্থনৈতিক জীবনে 'কড়ি' ও 'পোন'কে দ্রব্যবস্তুর পরিমাণক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। এই অর্থনৈতিক শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আদর্শ গুজরাট নগরের ক্ষেত্রে অনিবার্য নয়। প্রজাদের প্রতি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিপরীত আচরণের কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু ভাঁড়ু দত্তের মত শঠ চরিত্রের দ্বারা এরূপ কাজ কাহিনীর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

কাহিনী ধারা এখানে সহজ সরল গতিশীল। চরিত্ররাই কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মাছুয়ানীর উপর ভাঁড়ুর অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচার অভিযোগকেই কালকেতু ও ভাঁড়ুর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এর থেকে কাহিনীতে পুনরায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর মত নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার আড়ালে তার মহত্ত্ব ও উচ্চবিত্তের

স্বমহিমা প্রকাশ পেয়েছে। অপমানিত ভাঁড়ু দত্তকে কলিঙ্গ রাজ সুরথের কাছে উপস্থিত হওয়া তার মত চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। রাজা ভাঁড়ু দত্তকে দেখে পারাজয়ের বা অক্ষমতার লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে ভাঁড়ু দত্ত রাজার শান্ত সিগ্ধ লজ্জার ফাঁকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজদরবারের চাকরদের দোষী করেছে। রাজার তখন আত্মসম্মানে একটু উষ্ণ হাওয়া লাগে এবং সে মাথা তুলে তাকায়। সেই সময় ভাঁড়ু দত্ত মাথা নত করে। চরিত্রের স্বকীয় আচরণ কাহিনীকে জীবন্ত ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এবং ভাঁড়ু ও সুরথ কর্তৃক কাব্যে নাটকীয়তার প্রকাশ হয়েছে।

ভাঁড়ু দত্ত ও কলিঙ্গরাজ সুরথের নাটকীয়তার পর কাহিনীর সঙ্গে বিযুক্ত এই বৈষ্ণবীয় ভাবনার 'দিশা' টি অনিবার্য বলে বোধ হয় না। কলিঙ্গরাজের প্রজাবাৎসল্যের জন্য মাটিতে পড়ে ক্রন্দনেও প্রজাবৎসল রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দিশা অংশে বলা হয়েছে — ''দণ্ডের রাজা হএয়রে রাম হএ২।।''[১৫০] কলিঙ্গরাজের এরূপ বালকোচিত আচরণ একজন রাজার পক্ষে যেমন বেমানান তেমনি তার প্রজাবাৎসল্যের এই অংশটুকু মূল কাহিনী ধারা থেকে বাদ দিলেও যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হবে না। মূলতঃ বৈষ্ণবীয় অথবা হিন্দু ধর্মের প্রভাবের বশবর্তী হয়ে কবি এই অংশটি চিত্রিত করেছেন, ভাবা অসঙ্গত হবে না।

কেননা, আবার কলিঙ্গ রাজের ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন বালকসুলভ ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তার এই ক্রন্দনে চারজন সর্দারের আগমন এবং রাজার আদেশে তাদের কালকেতুকে বন্দী করতে যাওয়া বিপরীত ঘটনার সংঘাত ধ্বনিত হওয়া স্বাভাবিক। আচমকা কালকেতুর রাজদ্বারে আক্রমণ ঘটনাটি সংঘাতপূর্ণ ও গতিশীল বলা অসমীচীন হবে না। কালকেতুকে বন্দী করার জন্য কলিঙ্গের চার কোতালের শক্তির, বুদ্ধির ও আকারের বিশালতা কৌতূহলোদ্দীপক বটে। কালকেতুর রাজ্য আক্রমণে আগত কোতালদের মধ্যে দু' জনকে আকারে ও বুদ্ধিতে পুরাণ চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই যুদ্ধ বর্ণনাকে কবি পুরাণের যুদ্ধ সম করে অঙ্কন করেছেন। কবি প্রচলিত প্রকৃতি-বিষয়ক প্রবাদের দ্বারা যুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত সংঘাতকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

''ঢালি বন্দুকি পাইক তার নাহি লেখা।
ধবল মেঘেত জেন বিষ্ট দিল দেখা।।''[১৫১]

কবি কালকেতুকে বন্দী করার ঘটনা বর্ণনায় পুরাণ দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাকে সংঘাতপূর্ণ ও কবিত্ব যুক্ত করে তুলেছেন।

বলা বাহুল্য, কালকেতু চরিত্রটি এই বিপরীত ঘটনার প্রতিস্পর্দ্ধি। তার মধ্যে মোকাবিলা করার মত ক্ষাত্ররক্ত উপস্থিত। এমনকি, তার মত বীর ও শক্তিশালী ব্যাধের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা যেন যুদ্ধে যাত্রায় অধীর আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কালকেতু ফুল্লরার সঙ্গে পুরাণের

রাজ-রাজড়াদের মত পাশা খেলায় মত্ত ছিল। সেই রাজকীয় পরিবেশে পাইক অন্তঃপুরে এসে তাকে যুদ্ধের খবর দেয়। তখন কালকেতু কিন্তু পরিস্থিতি জানতে চেয়েছে; ভয়াবহ অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দেয় নি। প্রথমে উঁচুতে উঠে চারিদিকের অবস্থা লক্ষ্য করে। প্রজাদের ক্রন্দনে তার মন ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হয়। তার চরিত্রের বিচক্ষণতা ও প্রজাদের প্রতি সহৃদয় বোধ প্রতিকূল ঘটনায় আলোকবর্তিকা। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রচলিত লোকবিশ্বাস দ্বারা ফুল্লরা এই সংকটাবস্থাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। ফুল্লরা তাকে বলে —

''রামা অগ্রে হৈলা রাজা পচ্ছাতে কি নঞা মাঞা
জন্মিয়া মরন একবার।
পুরুষে পুরুষ মারে সংসারেত জশ বাড়ে
জন্মিয়া মরিব একবার।।
আমি না করিব চুরি কার সঙ্গে বাদন্তরি
কার সঙ্গে বিবাদ ঝগড়া।
ঝড়ে জেন পড়ে কালা এমতি ছিড়িব মাথা
হস্তি কাইটে ভরাএ খাপরা।।''[১৫২]

ফুল্লরার এই কথায় মনঃশিক্ষার উপাদান রয়েছে। তা সত্ত্বেও কালকেতু অনড়। তাই যুদ্ধে ফুল্লরার স্বামী কালকেতুর মৃত্যু হলে অনাথিনীর রূপ যৌবনের কী হবে সে বিষয়ে চিন্তিত হওয়া মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে ফুল্লরার মত নারীর পক্ষে ভাবনা স্বাভাবিক। ফুল্লরার মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর নারীর অনিকেত বা rootless ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে। এটাকে কারণ দেখিয়ে কবি শেষ পর্যন্ত কালকেতুকে দিয়ে দেবী চণ্ডীর পূজা করিয়েছেন। সেই দেবী পূজায় তন্ত্রের প্রভাব রয়েছে অনুমান করা যায়। তন্ত্রের দেবী ভাবনার সঙ্গে লোকবিশ্বাস একাকার হয়ে গেছে। কালকেতুর প্রদত্ত পূজায় আনন্দিত দেবী যুদ্ধে রক্ষা কবচ স্বরূপ 'হিড়িমকসের চাল' প্রদান করে। এই হিড়িমকসের চাল জীবন ধারণের প্রতীক বোধ হয়। সেই চালে ফুল্লরা দেবী দুর্গার কালী ও কমলা দ্বিবিধ রূপ দেখে। কালী এবং কমলা ভয়ঙ্করী ও শক্তি দেবী; তারা ভক্তকে সংকট থেকে রক্ষা করে। এই বিশ্বাস ফুল্লরার মত সমকালীন সমাজেও ছিল। তাই হয়তো কবি ফুল্লরার সম্মতিতে কালকেতুকে এই চাল নিতে আত্মস্থ করেন। যে ফুল্লরার একসময় দেবীর প্রতি অবিশ্বাস ছিল তার এখন প্রবল বিশ্বাস কালকেতুকে বিস্মিত করে। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গের যুদ্ধে দেবী-প্রদত্ত 'হিড়িমকসের চাল'-এর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে দেবী 'হিড়িমকসের চাল' থেকে শৃগাল, শকুনি ও সিংহ অবতার দ্বারা কালকেতুকে যুদ্ধে একে একে রামানন্দ, দেবানন্দ ও শোভানন্দের সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্ব সংঘাতে সাহায্য করেছে। তাতে প্রতিপক্ষের হাত থেকে ভক্ত কালকেতুকে রক্ষার

জন্য দেবী চণ্ডীর শক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। এই অবস্থায় কালকেতু বলে — "তিন দ্বার জিনিলাম দুর্গার বাহুবলে।।"[১৫৩] তাই কালকেতু দেবীর সহায়তায় নয়; নিজের ক্ষাত্র বলে যুদ্ধ জয় করতে চেয়েছে। কালকেতুর মধ্যে এই চারিত্রিক গুণটি পূর্ব থেকেই ছিল। তাই কাহিনী গ্রন্থনায় তার এরূপ আচরণ অসামঞ্জস্য নয়। পাইকরা তাকে পরধনে রাজা হওয়ার অভিযোগ শোনালে সে বলে —

"পর ধন জেবা জন খাবে পর ঘর।
ক্ষত্রিকুলের ধর্ম্ম নহে রণ ছাড়িবার।।"[১৫৪]

এই অংশে কালকেতু চরিত্রে সংগ্রামে যাত্রার প্রতি একাগ্রচিত্ততা ঘটনার মধ্যে দ্বন্দ্বের সুর ধ্বনিত করেছে। ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন — "গল্পের শেষে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ বর্ণনায় কিছুটা ঘটনাগত দ্বন্দ্বের সুর বেজেছে।"[১৫৫] তারপরও দেখা যায় যে, কালকেতু দেবী চণ্ডীর দ্বারস্থ হয়েছে। চরিত্রের মধ্যে যে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত স্পন্দন এবং গতিশীলতা বজায় ছিল তা পুনরায় স্তিমিত হয়ে যায়। কাহিনী ধারায় দেবী তথা তার শক্তিকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়াই তার অন্যতম কারণ। যুদ্ধে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন কালকেতুর দেহের উপর দেবীর বাম পা রাখা ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। তার এই রূপকে সকলে 'ছিন্নমস্তা' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। ভক্ত কালকেতুকে রক্ষার জন্য দেবী চণ্ডীর ছিন্ন মস্তা রূপ ও প্রেতরূপ শক্তি দেবীর অন্য এক মহিমা। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শক্তি দেবীর বিভিন্ন স্বরূপ-ভাবনা মানুষের মজ্জায় রয়েছে। কবি মানিক দত্ত তাকে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর রূপ ভেদে স্থান দিয়েছেন। এখানে কবির মধ্যে সাধকের দৃষ্টিভঙ্গিটি বড় হয়ে উঠেছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন — "... ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য দেবীগণের রূপ ও মহিমা যতই পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করুন না কেন, ধর্মব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহারাও ঐক্যবাদী; তাঁহাদের মুখেও ঐ এক কথা — একই মায়ের বিচিত্র লীলা!"[১৫৬] মধ্যযুগের ধর্ম সাধনা যুক্ত প্রথানুসরণই কবির মজ্জাগত। আর সেই যুগোপযোগী ধর্ম সাধনাই কবির কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাতে শেষ পর্যন্ত দেবীর অনুগ্রহ প্রার্থী কালকেতুর জয় এবং সুরথ রাজের পরাজয় ঘটে। দেবীর মহিমা প্রচারের মাঝে কালকেতু চরিত্রে প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতেও রাজার মত উঠে রুখে দাঁড়ানোর স্বতন্ত্র মহিমা সুপ্ত ছিল। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গ রাজের যুদ্ধ ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা এবং দেবী মহিমায় বেশি মনোযোগী হওয়ায় কবি কালকেতু চরিত্রটিকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তারপরও কবি ঘটনাকে চণ্ডীর মাহাত্ম্যকীর্তনে পর্যবসিত করেন। সেই মাহাত্ম্যটি হল ভক্ত-অভক্ত যে দেবীর প্রতি সদয় হয় দেবী তার অনুকূলে প্রীত হয়। ব্যর্থ সুরথরাজ কর্তৃক দেবী চণ্ডীর পূজা এবং তাকে অভয় প্রদানই তার প্রমাণ। সেখানেও তার শক্তি পূজা তথা তন্ত্রসাধনার পূজা পদ্ধতিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি, মধ্যযুগে সমাজ শ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সুরথরাজের যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টিও সমাজ সত্যকে প্রকট করে। সর্বোপরি, মধ্যযুগে দেবদেবী মহিমান্বিত অলৌকিক আবহমণ্ডলে পড়ে কবিরা সমাজের অনুকূলে কাব্যের ঘটনা সন্নিবেশনে মনোযোগী হতেন।

অবশেষে রাজা সুরথ কর্তৃক কালকেতুকে বন্দী করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনীতে নাটকীয় বর্ণনা কৌশল এবং হাস্যরসের আভাস রয়েছে। তা কবি কালকেতুকে বন্দী করার পূর্ব মুহূর্তের আগমন দৃশ্য তুলে ধরেছেন এই ভাবে —

"আইল সকল লোক গুজরাট নগরে।
কেহু টিপাটিপি করি জাএ পুরীর ভিতরে।।"[১৫৭]

তিনি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফুল্লরার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই বর্ণনার রীতি একেবারেই পাঁচালী ছাঁচের একটি দৃশ্য বর্ণনা করাই যেন কবির উদ্দেশ্য। কবি তা বর্ণনা করেছেন এই ভাবে—

"ভাডু দত্ত আইল জদি পুরীর ভিতর।
ফুলুরাকে লইয়া কিছু শুনহ উত্তর।।
ভাডু বলে শুন খুড়ি আমার উত্তর।
এখন জানি হইল খুড়া রাজ্যের ঈশ্বর।।"[১৫৮]

কালকেতুকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার সময় রামায়ণের রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার ছায়াপাত ঘটেছে — এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। কবি লিখেছেন —

"বীরকে লইয়া জাএ কান্দে রামা উভরাএ
বীরক করে পুরীর বাহিরে।
কান্দে নগরের লোক অনেক পাইল শোক
বীর কান্দে পিঞ্জর মাঝারে।।"[১৫৯]

কালকেতুকে বন্দী করে রাজা সুরথের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে সুরথের সঙ্গে কথোপকথনে ঘটনার পুনরাবৃত্তি রয়েছে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে যে কথা ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন তা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রেও মনে আসে — "ঘটনাসজ্জায় অনুবৃত্তি আছে, পারম্পর্য নেই। কালকেতুর জীবনের যে বিবরণ তাকে কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমন্বয় বলেই মনে হয়।"[১৬০] তবে কালকেতুর বন্দী এবং এরূপ দুরবস্থায় কালকেতুর 'চৌতিশা' কাহিনীতে মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত রীতি অনুযায়ী কালকেতু কর্তৃক বিবৃত হয়েছে। সেই চৌতিশায় কালকেতু দেবীর মহিমা স্মরণ করার পাশাপাশি ধন-লোভই তার দুঃখের কারণ সেই সামাজিক সত্যকেও তুলে ধরেছে। তার দুঃখ দেখে পদ্মা চণ্ডীকে রক্ষা করতে অনুরোধ করে। তাতে দেবী চণ্ডীর প্রতিক্রিয়া মানবিক। দেবী এখানে তার অলৌকিক

শক্তির প্রলেপ বাড়িয়ে প্রতিশোধ স্পৃহাপরায়ণ মানব চরিত্রে পরিণত হয়েছে। পদ্মা ও চণ্ডী চরিত্রের মানবিক আচরণ কাহিনীতে কালকেতুর বন্দীদশা উন্মোচনের একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই পদ্মার কথায় চণ্ডী কলিঙ্গরাজ সুরথকে স্বপ্ন দেখায়। সেই সঙ্গে কালকেতুর বন্দীকে কেন্দ্র করে কবি একটি সামাজিক সত্যের ছবিকে তুলে ধরেছেন। তা স্বামীর উদ্ধারের জন্য নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ কুলবধূ ফুল্লরার সমাজে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ভোগী ব্রাহ্মণ পদতলে লুটিয়ে ক্রন্দন করার চিত্র ফুটে উঠেছে।

এরপরেই কাহিনীতে ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি ঘটনাটির অবতারণা ঘটে। এখান থেকে কাহিনীর অন্ত্যপর্বের সূচনা হয়। তাকে মাথা মুড়িয়ে, গায়ে ঘোড়ার মূত্র দিয়ে, পিঠে মোড়া বেঁধে, চারপাশে সাতজন শত্রু বা 'বৈরী'কে দিয়ে সতর্ক পাহারায় রাখা হয়। তাদের দ্বারা তার মাথায় ওড়ের ফুল বাঁধা হয়। যে ব্যক্তি তাকে শুদ্ধি করতে আসে তাকে সে স্বীয় লজ্জা নিবারণের জন্য বারাণসীর তীর্থভূমি ভ্রমণের কথা উত্থাপন করে। ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি ব্যাধ খণ্ডের সমাপ্তিতেও জীবন্ত। কাহিনীর সঙ্গে তার উপস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এরপরই হঠাৎ কার্যকারণ সম্পর্কহীন একটা ঘটনার উত্থাপন করা হয়। সেটা হল কালকেতুর পরজন্মে স্বর্গে যাত্রার জন্য পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা। এইরূপ ভাবনার কারণ স্বরূপ বলা হয় —

"কোন ছাড় দত্ত ভাড়ুয়া নাবড় সে মোকে আটকুর বোলে
এত দুঃখ না সয় শরীরে।"[১৬১]

কালকেতুর মুখে এই কথার পূর্ব কোন সঙ্গতি নেই। যেন মনে হয়, কবি কাহিনীকে খুব সংক্ষেপে সমাপ্ত করতে ব্যস্ত হয়েছেন। কালকেতু তার উত্তরাধিকার ভাবনায় গঙ্গার তীরে দেবী চণ্ডীর পূজার জন্য মনস্থ করে। সেখানে দেবী চণ্ডীর পুরাণের 'হৈমবতী' ও জলদেবী রূপের সঙ্গে গ্রাম্য বধূর জীবন্তমূর্তি একাকার হয়ে গেছে। কবির কথায় —

"পূজিতে২ বীরের কায় সিদ্ধি হৈল
কৈলাস বাসিনি দেবী অন্তরে দেখিল।
বৌহারি মূর্ত্তি ধরি মলিন বসন পরি
কলসী কাখেত লইল।।
দেবী জলভরে জলক্রীড়া করে
ডাকিয়া বীরেক বলিল ভবানী।"[১৬২]

দেবীর এই মিশ্ররূপ সম্পর্কে সুকুমার সেন-এর একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — "এই সূত্রেই দুর্গা দেবীর সব চেয়ে পুরোনো নাম পাই 'হৈমবতী' অর্থাৎ 'হিমবৎ-বাসিনী'।... বাসন্তী দুর্গা পৃথক দেবতা। ইনি জলদেবী বা নদী দেবতা। বেদে এ দেবতার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। এ দেবতার

ভাবনায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী ঐতিহ্যের মিশ্রণ অনেকটা থাকতে পারে। পরবর্তী কালের পুরাণ কাহিনীতে এই জলদেবীর এক সংস্করণ জাহ্নবী হয়ে শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।"[১৬৩] এই অংশের বর্ণনায় কবি পুরাণ ও লোকজীবনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, শেষে দেবী তাদের পুত্র সন্তান দিতে অস্বীকার করলে তারা অগ্নিতে প্রবেশ করে স্বর্গ পুরে যাত্রা করে। মৃত্যুকালীন হিন্দু সংস্কার এখানে স্পষ্ট। কালকেতু ও ফুল্লরা দুজনে স্বর্গে গিয়ে স্বর্গের পরিচয় ধারণ করলেও নীলাম্বরের সঙ্গে পিতার সাক্ষাৎ স্বর্গের 'হৃদিহীনতা'কে ভুলিয়ে দেয়। কবি সেখানেও মানবিক গুণের স্পর্শ দিয়েছেন। তিনি বাৎসল্য রসের স্নিগ্ধ ধারায় স্নাত করে ব্যাধ খণ্ড সমাপ্ত করতে বেশি আগ্রহী। সেই বর্ণনা এরূপ —

"ইন্দ্রপুরি শুনি নীলাম্বরের কথা।
হরিস বদনে ইন্দ্র আইল তথা।।
প্রাণপুত্র বলি আগুলিয়া লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুমু দিল বদন কমলে।।"[১৬৪]

এইভাবে, কবি মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যান একটি অসমাপ্ত বৃত্তাকার প্লটে সমাপ্ত করেন। জন্ম, বিবাহ, পুত্র সন্তান প্রসব ও মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে যে একটি সমগ্রবৃত্তের কাহিনী তা এখানে পাওয়া গেল না। অতঃপর গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে ব্রত প্রচার করার কথা।

"চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত হইল।।
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করিঞা।
বসিলা ভবানী দেবী চিন্তাযুক্ত হয়া।।
নারদে উঠিয়া বোলে ঈশ্বর ঘরনি।"[১৬৫]

এই ব্রতের প্রচার মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতার প্রকাশ করে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে — "ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে দিয়া একটি প্রধান গুণ এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অতএব ব্রতকথাগুলি একটি প্রাচীনতর ও অধিকতর রক্ষণশীল ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোন কোন সময়ে যে ব্রতকথার কাহিনী পল্লবিত হইয়া মঙ্গল কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়, ইহার অর্থ এই যে, ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেরণা ও বিষয়-বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে — মঙ্গলকাব্য হইতে ব্রতকথার প্রেরণা কিংবা বিষয়-বস্তু গৃহীত হয় নাই।"[১৬৬]

'কালকেতু উপাখ্যান' বা 'ব্যাধ খণ্ড' পেরিয়ে কবি মানিক দত্ত ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির উপাখ্যান তথা বণিক খণ্ডে প্রবেশ করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এটিই কাব্যের শেষতম খণ্ড বা বিভাজন। এই খণ্ড সম্বন্ধে সুকুমার সেন তাঁর মুদ্রিত 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন — "কালকেতু-উপাখ্যানের তুলনায় ধনপতি-উপাখ্যান বেশি জনপ্রিয় ছিল, অর্থাৎ ধনপতি-শ্রীপতির কাহিনীটিই প্রধানত গীত হইত। তাই এই উপাখ্যানটির পুথি বেশি পাওয়া যায়। শুধু কালকেতু-উপাখ্যানের পুথি দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"[১৬৭] এই জনপ্রিয়তার পিছনে কয়েকটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে — (১) কালকেতু উপাখ্যানে আরণ্যক পরিবেশে একজন নির্ধন ব্যাধ দেবী চণ্ডীর অলৌকিক মহিমায় রাজায় পরিণত হওয়া — এই কাহিনীর সঙ্গে শ্রোতা ও পাঠকমণ্ডলীর একাত্মতার অভাব ঘটে। অন্যদিকে, ধনপতি খণ্ডের কাহিনীতে অভিজাত সমাজের কথা স্থান পেয়েছে এবং সেখানে সামাজিক কাঠামোয় গার্হস্থ্য পরিবেশ পাঠকের কাছে অধিক আকর্ষণের কারণ, তা বলাই বাহুল্য। (২) কালকেতু-উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী ফুল্লরার তুলনায় কালকেতুর উপর বেশি জোর দিয়েছে। কিন্তু ধনপতি বা 'বণিক খণ্ড'-এ ধনপতির তুলনায় নারী খুল্লনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীর কৃচ্ছতা, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা, পারিবারিক জীবনে নারীর সতীন সমস্যা অত্যন্ত জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। (৩) এই কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানটিতে বাঙালীর ঘরের কথা বড় হয়ে উঠেছে। সপত্নী সমস্যার তীব্রতা এক বিশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রোতাকে সচকিত করে। কামনাসর্বস্ব ধনপতি, লহনার বিগত যৌবন, প্রেমহীনতার ব্যথা, খুল্লনার দুঃখভোগ ধনপতি কাহিনীকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

দেবী চণ্ডীর বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজা প্রচারের জন্য ধনপতির উপাখ্যানের অবতারণা। সেক্ষেত্রে ধনপতি উপাখ্যানে স্পষ্টতই দুটি ভাগ আছে। প্রথমে খুল্লনা ধনপতির পরিচয় ও বিবাহ এবং ধনপতি খুল্লনার পুনর্মিলন। দ্বিতীয় অংশে রাজাদেশে ধনপতির সিংহল যাত্রা এবং সেখান থেকে মুক্তিলাভ। এর মধ্যেই দেবীর মহিমাজ্ঞাপক মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। তার জন্য কাহিনীতে বহু ঘটনার ও উপকাহিনীর সংস্থান ঘটেছে।

প্রথমে ধনপতি ও লহনার জন্ম, বিবাহ, খুল্লনার সঙ্গে প্রণয় বা মোহের কারণে বিবাহ, গৌড়ে যাত্রা এবং খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির পুনর্মিলন ঘটে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বে কবি মানিক দত্ত আখেটিক খণ্ডের সঙ্গে ধনপতি খণ্ডের কার্যকারণ সূত্রকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। 'আখেটিক খণ্ড'-এর সমাপ্তি যদি কারণ হয়, তবে 'বণিক খণ্ড' তার কার্য। সেই কার্যকারণ সূত্রটি একটি স্বরে আবদ্ধ। সেটি হল দেবীর অষ্টদিনের ব্রতপ্রচার করা। আখেটিক খণ্ডের শেষে কালকেতু পুনরায় স্বর্গে নীলাম্বর রূপে প্রত্যাবর্তন করলে দেবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে।

''ইন্দ্রের পুত্রবধূ ইন্দ্রের তরে দিল।
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত হইল।।
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করিঞা।
বসিলা ভবানী দেবী চিন্তাযুক্ত হয়া।।''[১৬৮]

একই ব্রতকথার অনুবর্তন বণিক খণ্ডের সূচনায়। সেই সময় নারদ তাকে নলকুবেরের পুত্র কর্ণমুনিকে ছলনার কথা বলে এবং তার দ্বারা বাকি চার দিনের ব্রতকথা প্রচারের পরিকল্পনা করে।

''পুনরপি নারদ বলে শুন মামী তুমি।
নল কুবরের পুত্র নাম কর্ণমুণি।।
তাহাকে ছলিয়া নাম্ভায়ো আদ্যা ভবানী।
তাহা হৈতে চারিদিনের পাবে পূজাপানি।।''[১৬৯]

প্রথমে উপায় স্বরূপ নারদ তাকে রূপ-যৌবন দিয়ে শিবকে ভোলাতে বলে। নারদ চরিত্রটিকে এখানে কবি কাহিনীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছেন। তাতে দেবী চণ্ডীর রূপ-সজ্জার দীর্ঘ পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সমকালীন সমাজে উচ্চবিত্ত নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, বিচিত্র বহু মূল্যের অলংকার ও সুগন্ধী পুষ্প পরিধানের পরিচয় আমরা দেবীর রূপসজ্জায় লক্ষ্য করি।

''ষোড়শ বৎসরের দেবী জৌবন হৈইল।
বেশ করিতে দুর্গা আপনে বসিল।।
পেটারি ধরিয়া তার ঘুচাইল ঢাকনি।
হস্তে করি লইল চিরণ কাঁকৈখানি।।
সুবর্ন চিরনি দুর্গা হস্তে করিয়া।
গোট২ কেশ জত নইল ঊভারিয়া।।
বারটি বিয়নি কৈল খোপার গাথনি।
সুগন্ধি সুজাতি পুষ্প খোপার সাজনি।।
পুষ্প সৌরবে অলি উড়ে সারি২।
জড়াজড়ি করিয়া পড়ে ভোমরা ভুমরি।।
*　　　*　　　*
মধুমত্ত হইয়া ভ্রমর উড়িতে না পারে।।
পত্র বিদারে পুষ্প গন্ধ দূরে জায়ে।
মহামত্ত হইয়া খোপার মধুখায়ে।।

সুগন্ধি তৈল দিয়া মুখ্যানি মাঞ্জন।
পূর্নিমার চন্দ্র জেন দেখিতে সুশোভন।।
*　　　　　*　　　　　*
নাসাতে বেসর পড়ে করে ঝলমল।
পূর্ন শশী জিনি মাতা শ্রীমুখমণ্ডল।।
বেশে বেষ্টিত মাতা মধ্যে শোভে চুনি।
মুকুতার হিল্লোল তার মধ্যে মনি।।
অধরে অরুণ ছটা জেন বিম্বফল।
কপালে সিন্দুর পড়ে নঞানে কজ্বল।।
উপর কর্ণের অলঙ্করন করে ঝলমল।
নাম্ভা কর্ণেত মাতা পড়িল কুণ্ডল।।
নাসিকার উপরে মাতা অর্দ্ধচন্দ্র শোভা।
শ্রীমুখমণ্ডল জেন অরূণের আভা।।
গলাতে সুবর্ণ হার নাম মনোহর।
বনমালা হৃদে দোলে পরম সুন্দর।।
অক্ষয় কবচ পড়ে হৃদয় মাঝার।
মণিমুক্তা থোপা২ গাথনি তাহার।।
দুই হস্তে শোভা করে সোবন্ন দুই তাড়।
দুই থরে বাজুবন্ধ বিবিধ প্রকার।।
দুই বাহু শঙ্খ পড়ে শ্রীরামলক্ষন।
হেটে উপড়ে শোভে চারি কঙ্কন।।”[১৭০]

এই বর্ণনায় কীট-পতঙ্গের আকৃষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গে দেবীর কামোত্তেজিত রূপ বা শৃঙ্গার রসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শঙ্খের বন্ধনে রাম-লক্ষণের অটুট বন্ধনের উপস্থাপনা অন্তত শ্রোতা বা পাঠকের কাছে কৌতূহলও আকর্ষণের বিষয়। সর্বোপরি, মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসরণের দিকটি প্রাধান্য পেলেও কাহিনী গ্রন্থনের দিক থেকে এই রূপ সজ্জার বিবরণীতে দৃঢ়তা হারিয়েছে। কিন্তু দেবীর রূপের সঙ্গে পূর্ণিমার চাঁদ, পূর্ণ শশী, অরুণের ছটার, অর্ধচন্দ্র, অরুণের আভা ইত্যাদির মত উপমা ব্যবহারে মানিক দত্তের কবিত্বের পরিচয় রয়েছে।

কবি দেবদেবীর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রতি মুহূর্তের জীবন-সংস্কারকে সন্নিবেশিত করেছেন। তাতে কাহিনী গ্রন্থনায় পরিবেশ পরিস্থিতিতে সমকাল সমাজ কার্যকর হয়েছে। তা

বর্ণিত হয়েছে এইভাবে যে, দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শিবের কামোত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সেই মুহূর্তে দেবীর আচরণ নাট্যাভিনেত্রীর ন্যায় বলে মনে হয়। পাশাখেলা হারজিতের উপর শিবের মনোবাঞ্ছা পূরণের অভিপ্রায় নির্ধারণ করল। সেই ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা হল কর্ণমুনিকে। কিন্তু কর্ণমুনি শিবের ভয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে নারাজ হলে দেবী তাকে উদ্ধার করার কথা উত্থাপন করে। কর্ণমুনিকে মিথ্যাসাক্ষী দেওয়ার জন্য তথা চণ্ডীর স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাকে পুরাণের একটি কাহিনী শুনিয়েছে। সেই পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী ধারার সঙ্গে মিল নেই; কিন্তু চরিত্রের মনের দৃঢ়তা বন্ধনের উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার উপাদান স্বরূপ পুরাণ-কাহিনীকে মূল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর প্রসঙ্গে অবতরণ ঘটেছে। সেই বহির্ভূত কাহিনীটি হল রামায়ণের কাহিনী। চণ্ডী কর্ণমুনিকে বলেছে —

"সাক্ষী দিতে তোর বৈরী হয় শূলপাণি।
উদ্ধারিয়া লব তোরে নম নারায়নী।।
রাবণ সেবক তার ত্রিভুবনে জানে।
চদ্যচৌযুগ অমর বর দিল পঞ্চাননে।।
এতেক বৈভোগ তার লঙ্কার ঈশ্বর।
শ্রীরামের ব্রহ্ম অস্ত্রে গেল জমঘর।।
শুনিয়াছি মহিষাসুর শিব ভজন করে।
ভজনেত তুষ্ট হইল দেব দিগাম্বরে।।
শিব বলে মহিষাসুরা বর লেহ তুমি।
জেই বর চাহ তাহা তোরে দেই আমি।।
কাগতি মিনতি করিল বিস্তর।
একরাত্রি দেহ মোকে গৌরীর বাসহর।।
শিব বলে কপটে তুমি চাহিলা বাসহর।
দেব মায়া না বুঝিলা সে হত বর্ব্বর।।
শিবের বরে ছলিতে য়াইলা মহিষাসুর।
অস্ত্রে মাথা কাটিয়া পঠানু জমপুর।।"[১৭১]

এবং রামায়ণের কথা বলতে বলতে আবার চণ্ডী শিব কর্তৃক তার সেবক ইন্দ্রকে লাঞ্ছনা করার কথা উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করে। কালকেতুর দ্বারা তার চারদিনের ব্রতকথা প্রচার হয়। তার চারদিনের ব্রতকথা প্রচারের জন্যই কর্ণমুনিকে ছলনা। একথা বলতে গিয়ে কাহিনীতে যেমন রামায়ণের কথা এসেছে তেমনি বর্তমান পরিস্থিতির উপায় সন্ধানে অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি

ঘটেছে। সেই সঙ্গে চণ্ডী কর্ণমুনিকে বণিক ঘরে জন্মাবার কথা বলার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী বণিক শ্রেণীর উন্নত সামাজিক অবস্থানকেও পরিস্ফুট করেছে। এতে কবির বণিক শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডী কর্ণমুনিকে বলে —

> ‘‘মিথ্যা কথা কহিতে জদি শাপ দেন তোরে।
> উত্তম স্থানে জন্মাইব ধনিকের ঘরে।।
> বণিক কুলে জন্মাইব তোখে দিব ঘর বাড়ি।
> বিবাহ করাইব দুই পরম সুন্দরী।।’’[১৭২]

চণ্ডীর এই কথায় সমাজের বহু বিবাহ প্রথা ও বণিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দময় জীবনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কাহিনী গ্রন্থনায় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি লৌকিক অভিপ্রায়কে সামনে আনা হয়েছে। সেই জন্য কর্ণমুনিকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলার জন্য বাক্‌দেবী সরস্বতীর স্মরণ। তার কাক বাহন কাহিনীতে বিরল ব্যতিক্রম। এখানে কবি পাখির সঙ্গে লোকমানসের নিবিড় সংযোগ লক্ষ্য করে সম্ভবত প্রাচীন দেবী সরস্বতীর সঙ্গে লোক জীবনে পরিচিত কাককে বাহন হিসাবে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত, নির্মলেন্দু ভৌমিক-এর একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — ‘‘কাক ধূর্ততার প্রতীক বলে সর্বত্র স্বীকৃত, ‘ধূর্ত’ বললে কাককে অধঃপতিত বলে মনে করা হয়।’’[১৭৩] বাক্‌দেবীর সঙ্গে এই ধূর্ত কাককে সংযুক্ত করার পিছনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এই অংশে বর্ণিত সরস্বতীর ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিপ্রায়টি সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। এই বাক্‌দেবী কর্ণমুনিকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে। স্বভাবতই, কর্ণমুনিকে শিব মিথ্যা সাক্ষীর জন্য নরলোকে জন্মের অভিশাপ দেয়। এরূপ কাব্যের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অভিশাপ দান মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে কাহিনীর পটভূমি পরিবর্তনের একটি অভিপ্রায় অত্যন্ত সুকৌশলে কবিরা প্রয়োগ করতেন। তবে চণ্ডীর চক্রান্তে শিব কর্তৃক স্বীয় শিষ্য অভিশপ্ত হয়। এতে শিব ক্রুদ্ধ হলে চণ্ডী তাকে তার প্রতি বিরাগ দূর করতে তাদের ‘অর্ধনারীশ্বররূপ’ বা ‘হরগৌরী’ মূর্তির কথা বলে এবং উভয়ে মিলনে আবদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে শশিভূষণ দাশগুপ্তের একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — ‘‘তন্ত্রমতে অদ্বয়-সত্যের দুই রূপ; একরূপ গুণাতীত নিবৃত্তিস্বরূপ — এই রূপই চিন্মাত্রতনু শিব ও অপর রূপ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি — তিনি প্রবৃত্তিস্বরূপিণী — সংসার-প্রপঞ্চের কারণভূতা। এই শিব বা শক্তি কেহই অন্যোন্যনিরপেক্ষ নহেন; পরম অদ্বয় স্বরূপে এই উভয়ে থাকেন এক হইয়া — ইহাই শিব-শক্তির মিথুনরূপ। এই শিব-শক্তি মিলিতাবস্থাই পরমার্থ — ইহাই জীবের একমাত্র কাম্য।’’[১৭৪] অন্যদিকে, শৈব-শাক্তের দ্বন্দ্ব মিমাংসার আভাস পাওয়া যায়। কবি ও সমালোচক কালিদাস রায়

বলেছেন — ‘‘শিবদুর্গার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখাইয়া কবি শৈবশাক্তের দ্বন্দ্বের সমাধান যেমন করিয়াছেন — চণ্ডীর মুখে হরিনামের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া তেমনি শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বেও মীমাংসা করিয়াছেন।’’[১৭৫] চণ্ডী বলে —

‘‘হরগৌরী দুই করি জানে জেইজন।
দ্বিতীয় ভেদ করিলে তার নরকে গমন।।’’[১৭৬]

‘হরগৌরী’-র অভেদ তত্ত্বই শিবের বিরূপ ভাবনার পরিবর্তনের কারণ। তারফলে সে কর্ণমুনিকে মর্ত্যে গিয়ে চণ্ডীর পূজা প্রচারে অনুমতি দেয়। তারপর কর্ণমুনির মর্ত্যে জন্ম নিয়ে ক্রন্দন। সেই ক্রন্দনের কারণ হয়ে উঠেছে হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ, জন্মান্তরবাদ, মনুষ্য জন্মের দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি বিষয়গুলি। কিন্তু দেবী চণ্ডী তাকে ধনি বণিক গৃহে জন্মানোর আশ্বাস বাণী শোনায় এবং তাকে আত্মস্থ করার জন্য পুনরায় হরগৌরীর অভেদ তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর চণ্ডী কর্ণমুনির ‘প্রাণ’ বা ‘জীব’ আঁচলে নিয়ে মর্ত্যে গমন করে। এরই সঙ্গে কাহিনীর পটভূমিকা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন করে। নতুন আরও চরিত্রের সমাবেশ ঘটে কাহিনীর মধ্যে। সেই সঙ্গে মর্ত্যমানবের জৈবপ্রবৃত্তি ও জন্মকালীন রীতি-নীতির বিষয়গুলি কাহিনীতে স্বভাবতই অনুপ্রবেশ করে। কর্ণমুনির ‘জীব’ বা প্রাণ নিয়ে দেবী চণ্ডী উজানী নগরের জয়পতির গৃহে আসে। জয়পতি যাতে তার স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গে মিলনের জন্য পীড়িত হয় তার জন্য কামদেব চরিত্রের আগমন।

তারপর কর্ণমুনি মর্ত্যে ধনপতি নামে জন্মানোর আগে গর্ভধারী মাতার অবস্থার পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর অনিবার্য বিষয় হিসাবে ধনপতি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তীর্থের জলে স্নান, ষষ্ঠী জাগরণ, নামকরণ, পাঁচ মাসে চূড়াকরণ ইত্যাদি সামাজিক রীতি-নীতিগুলি এসেছে তা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের বলে মনে হয়। যা মঙ্গলকাব্যের প্রথানুগত ও ধনপতির মত বণিক গৃহের পক্ষে তা অসামঞ্জস্য নয়। কবি বলেছেন —

‘‘নানা তীর্থের জল দিয়া স্নান করাইল।
তিন দিবসের ছাল্যা ধুল বাড়াইল।।
পাচ দিবসের ছাইলা পাচটি করিল।।
ছয়দিবসে করিল ষষ্টি জাগরণ।
একমাসে করাইল তার নামকরণ।।
শতেক ছাইলার নাম বাছিল জয়পতি।
ব্যাক্ত নাম থুইল সাধু ধনপতি।।
দিবসে২ বাড়ে সাধুর নন্দন।
পঞ্চ বৎসরের কালে কৈল চূড়াকরণ।।’’[১৭৭]

এরপরই কবি গল্প বলার ঢঙে লহনার জন্মের কথা বলেছেন। কবি বলেছেন — ''অখন লহনার জন্ম শুন বিবরণ।।''[১৭৮] কিন্তু তার 'জন্ম কথা' নামমাত্র কাব্যে স্থান পেয়েছে। তা কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে কবির সংযমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ফুল্লরার তুলনায় ধনপতির প্রতি কবির আগ্রহের দিকটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নিধুপতির ঘরে শুধু তার জন্ম একথাই এখানে পাই। জন্মের সাত বছর পর থেকে লহনা দেবী চণ্ডীর ব্রত পালন করে। তাতে মেয়েলী ব্রতে সকলের মঙ্গল উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে। ব্রত কামনার ফলস্বরূপ ধনপতির মত গন্ধ বণিকের সঙ্গে তার বিবাহ। ব্রতকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-প্রচলিত বাল্য বিবাহের ও রামায়ণ কথা তুলে ধরা হয়েছে। কবি মধ্যযুগের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুকূল করে লহনার দ্বাদশ বৎসরে বিবাহের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেই সঙ্গে কবি লহনার স্বামীর কথা বলতে গিয়ে রামায়ণের রামের মত পতিপরায়ণ স্বামী-আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। এইভাবে কবি মানিক দত্ত লহনার বিবাহের পূর্বাভাস বা ভূমিকায় লৌকিক ব্রতকথার প্রয়োজনীয়তা ও রামায়ণ প্রসঙ্গকে এক সূত্রে বেঁধেছেন।

সমাজে প্রচলিত বিবাহ-সম্পর্কিত রীতি-নীতি মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসারে কাব্যে এসেছে। লহনার বিবাহ বিষয়ে তা লক্ষ্য করা যায়। লহনার বিবাহ বর্ণনায় উচ্চ হিন্দু সমাজের আভাস পাওয়া যায়। নিধুপতি তার বিবাহযোগ্য কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হওয়া এবং তার কুলের ব্রাহ্মণকে ডেকে আনা স্বাভাবিক। সেই পরিস্থিতিতে নিধুপতি তার কাছে জয়পতির সুন্দর পুত্র ধনপতির কথা জানতে পায়। ধনপতি ও লহনার বিবাহ নিয়ে নিধুপতি ও ব্রাহ্মণ ঘটকের কথাবার্তায় বিবাহ-বিষয়ক কয়েকটি আশ্চর্য নিয়ম নীতি সঙ্গত কারণে পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। সেগুলি হল — কুল বিচার, শুভক্ষণ নির্ধারণ, নক্ষত্র রেবতী বিচার, দিনক্ষণ বিচার ইত্যাদি। কবি লহনার বিবাহে ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও দানে দাসী দেওয়ার রীতি আর্যসংস্কৃতির পরিচায়ক রূপের বর্ণনা করতে বিস্মৃত হন নি।

> ''দানদ্রব্য দিল সাধু সেইখানে বসি।
> কন্যার সংহতি দানে দিল দুবাদাসি।।''[১৭৯]

বিবাহে দাসীদের পণ্যে পরিণত করার রীতি মধ্যযুগের অভিজাত পরিবারে প্রচলন ছিল। সেই রীতির প্রতিভাস পাই ধনপতির বিবাহে নিধুপতির কন্যার সঙ্গে দাসী দানে দেওয়ার ক্ষেত্রে। অতুল সুর এই প্রথা সম্বন্ধে বলেছেন — ''দাসদাসী রাখা ঋগ্বেদের আমল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। তবে মধ্যযুগে এই প্রথা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল।''[১৮০] ধনপতির বিবাহ রীতির বিভিন্ন প্রথা উচ্চবিত্ত সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাহিনীতে স্থান দেওয়ায় তা অনেকটা বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেছে। তবে পুত্র বিবাহের পর জয়পতির মৃত্যু কার্যকারণ সম্পর্কহীন। তা কাহিনীতে গল্পের মত। প্রসঙ্গত, F. M. Forster -এর Plot সম্পর্কে বলতে গিয়ে

গল্পের সঙ্গে প্লটের পার্থক্য করেছেন — " 'The king died and then the queen died,' is a story."[১৮১] জয়পতির মৃত্যু এরূপ একটি গল্পমাত্র। তবে জয়পতির অন্তেষ্টিক্রিয়া হিন্দুসংস্কার মেনে কবি বর্ণনা করেছেন।

তবে কবি লহনার চিত্র গল্পের ঢঙে তুলে ধরছেন। তার বলন ভঙ্গী গল্পের ঢঙের। যেমন — "লহনাক লইয়া কিছু শুন বিবরণ।।"[১৮২] এই বিবরণটি হল লহনার দেবী চণ্ডীর প্রতি অন্যমনস্কতা এবং তাকে দেবীর সতীন ও নিঃসন্তানের অভিশাপ প্রদানের ঘটনা। দেবী চণ্ডী যেমনি নিঃসন্তানকে সন্তান প্রদান করতে পারে তেমনি বিরূপ হলে সংসারের সুখ হরণ করতে পারে — সেই স্বরূপটি এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডীর এরূপ অভিশাপ কাহিনীর মোড় ঘোরাতে সাহায্য করেছে।

কবির বর্ণনা কৌশলে স্বর্গকে কঠোর বাস্তবের মাটিতে বিভূষিত হয়েছে। এ কাহিনীর পটভূমি স্বল্পসময়ের জন্য স্বর্গপুরে পরিবর্তন হয়। চণ্ডীর মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীর পটপরিবর্তন। একই সঙ্গে সরল প্লটের মত কাহিনীতে আরো চরিত্রের আগমন ঘটেছে। নারদের পরামর্শে চণ্ডী ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য হল রত্নমালাকে ছলনার দ্বারা অভিশপ্ত করে মর্ত্যে তার পূজা প্রচার করা। কবি তার আগে মালাধরের পরিচয় দিয়েছেন। তার পিতা জয়ধর এবং মাতা রত্নমালা; তার দুই স্ত্রী উলুবা ও দুলুরা। তারা সকলে দেবসভায় নর্তকী। তাই চণ্ডী ইন্দ্র সভায় তাদের নৃত্য দেখতে যায়। ইন্দ্র মাতুলি নামে একজনকে দিয়ে রত্নমালাকে সহ পাঁচজন নর্তকীকে ডাকতে আদেশ দেয়। তারা ক্ষণেক আগে এই সভায় নৃত্য করে পরিশ্রান্ত। কিন্তু তারা বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত রাজ-আদেশের কাছে নিরুপায় হয়ে মাথা নত করতে। তাদের কথায় নিম্নশ্রেণীর পরিশ্রমিদের উপর অসহায়, যৎপরোনাস্তি, যথেচ্চার অত্যাচারের প্রত্যক্ষ বাস্তবরসের চিত্রটি অনুমান করা যায়। এই পরিশ্রমের কারণেই রত্নমালার নৃত্যে তালভঙ্গ, চণ্ডী কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়া এবং মর্ত্যে জন্মগ্রহণের কার্যকারণ ঘটনার বিবৃত হয়েছে।

স্বভাবতই, রত্নমালা ইছানী নগরের রম্ভার উদরে খুল্লনা নামে জন্মগ্রহণ করে। তার জন্মের বৃত্তান্ত ও জন্মের পর পবিত্র জলে স্নান, ছয় দিনে ষষ্ঠী জাগরণ, এক মাসে নামকরণ, পাঁচ বছরে চূড়াকরণ, তালপাতার কাঠি দিয়ে কর্ণচ্ছেদ প্রভৃতি রীতি ধনপতির মত উচ্চবিত্তের সংস্কার মেনে এখানে বর্ণিত হয়েছে। দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে। ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের কারণ — সে আঁটকুড়া এবং সেই জন্য রাজ্যে আর্থিক দুর্ভোগ। ধনপতিকে এই আঁটকুড়া অপবাদ দেওয়ার নিমিত্তে দেবীর দ্বারা রাজাকে স্বপ্ন দেখান হয়েছে। এখানে অলৌকিক বিষয়কে ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের কারণ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

“চিয়রে দণ্ডের রাজা গায়ে কর বল।
তোর ঘরে আইলাম দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল।।
আটকুড়া ধনপতি আছে নগর ভিতর।
তাহাকে পুরিতে য়াসিতে না দিহ সত্তর।।”[১৮৩]

কিন্তু রাজা রাজ্যের দুরবস্থার কথা উপস্থাপন করলে ধনপতি তা অর্থ দিয়ে নিবারণের উপায় বের করে। তাতে সমাজে বণিক শ্রেণীর ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যই বড় হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক রাজা তাকে দ্বিতীয় বিবাহের কথা বললে সে সতীন সমস্যার তীব্রতার বিষয়টি রাজার সামনে তুলে ধরে। মধ্যযুগে উচ্চবিত্ত সমাজে বহুবিবাহ প্রথা ব্যাপক প্রচলন ছিল সত্য। তার যন্ত্রণাও কম ছিল বলে মনে হয় না। তাই ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহে অনীহা প্রকাশ স্বরূপ সতীন জ্বালার তীব্রতাকে উন্মোচন করে। এই সতীন সমস্যা-রূপ সামাজিক ব্যাধি রাজার সামনে উপস্থাপিত করলেও দেবীর স্বপ্নাদেশই এখানে বড় হয়ে ওঠেছে। শেষ পর্যন্ত ধনপতিকে কোতাল দিয়ে রাজ দরবারের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। ধনপতি গৃহে পা দেওয়া মাত্র লহনার স্বামীপরায়ণতা লক্ষ্য করে তার কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হয়। ধনপতি এরূপ একটি উত্তপ্ত কটুক্তি শুনেও পরিস্থিতির কাছে মৃদুভাষী; তা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কবির ভাষায় —

“আইল লহনা নারী হস্তেত জলের ঝারি
বলিতে লাগিল সাধু মৃদু২ করি।।”[১৮৪]

ধনপতির দাম্পত্য জীবনে কোন সন্তান না হওয়ায় স্ত্রী লহনাকে তার জন্য দায়ী করেছে। লহনা তার কাছ থেকে চার বৎসর সময় চেয়ে নিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজের রাগ সংবরণ করতে পারে না। নিঃসন্তানবতী লহনা অন্যপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে সন্তান প্রসব করার কথা বললে সেই তীব্র জ্বালাময় বাক্যবাণ ধনপতি সহ্য করতে পারে না। সেই দাম্পত্যের কলহে দুর্বলা দাসীর আগমন, এরপর ধনপতির পায়রা উড়াতে বের হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত সুসঙ্গত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। দাম্পত্য কলহকে কেন্দ্র করে কবি ধনপতির পায়রা উড়ানোর মাধ্যমে পূর্বেই শ্রোতাগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বাভাস।

“সাধু বলে কোথা গেলা দুবুলা কিঙ্করী।
বাঞ্ছি লহনার তাপ সহিতে না পারি।।
পাএরা খেলিতে জাব ইছানি নগর।
তথা বিবাহ করিব লক্ষের সদাগর।।”[১৮৫]

লক্ষণীয়, ধনপতির সঙ্গে এই পর্যন্ত লক্ষপতির বা তার কন্যা খুল্লনার যোগাযোগ বা পরিচয়ের কোন বার্তা কাহিনী ধারায় পাওয়া যায় নি। হঠাৎ ধনপতি কর্তৃক লক্ষপতির কন্যাকে বিবাহ করার

বিষয়টি উত্থাপন যে সম্পর্ক সূত্রহীন তা অনুমান করা যায়।

তবে কাহিনীতে ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার সাক্ষাৎকল্পে অভিজাত বণিক সমাজের পায়রা উড়ানোর ঘটনাটি এসে যায়। ধনপতি যে ধনি অভিজাত তার প্রমাণও রয়েছে কাহিনীতে। সে পায়রা উড়ানোর জন্য সঙ্গে জনার্দন ওঝা ও পথপ্রদর্শক হিসাবে তার ভাই বুলনকে নিয়েছে। সেই খেলার পটভূমি ধুলিয়া ময়দান। সেখান থেকে ধনপতির পায়রা গিয়ে লক্ষপতির দক্ষিণ ঘরের চালে বসে। আর খুল্লনা তখন উত্তর ঘরে বারান্দায় খেলা করছিল। পায়রা যেন ধনপতি ও খুল্লনার মিলনের মধ্যস্থতা করেছে। তার সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই পায়রার মধ্য দিয়ে কবি খুল্লনার প্রতি কামোত্তেজনার একরূপ আভাস দিয়েছেন, বলা যায়। কেননা, ধনপতির পায়রা খুল্লনার কাঁচুলির আঁচলে নর-নারীর মিলন ছবি দেখে তার আঁচল ছিঁড়ে দেয়।

''আচলের মধ্যে লবরঙ্গ দেখিয়া
কাচুলি চিরিয়া ফেলিল।।''[১৮৬]

স্বাভাবিক ভাবে ধনপতিও খুল্লনার কাছে পায়রা আনতে গেলে তার প্রতি কামমুগ্ধ হয়। যে ধনপতির আঁটকুড়া অপবাদে আত্মসম্মান জাগ্রত হয়, কামদগ্ধ হয়ে সেই ধনপতিই মান সম্মান বোধ হারিয়েছে। সমাজে দ্বিতীয় বিবাহের তুলনায় আঁপকুড়া অপবাদ কঠোর ছিল বলেই ধনপতি চরিত্রের এইরূপ সঙ্গতিপূর্ণ পরিবর্তন সে নিজের খুড়তুতো শ্বশুরকে সরাসরি নির্লজ্জের মত খুল্লনাকে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। সে প্রথমে লক্ষপতিকে উপযুক্ত কন্যার বিবাহ না দেওয়ার ব্যর্থতা পরিবেশন করেছে। লক্ষপতি সমাজের এই সত্যকে নতমস্তকে গ্রহণ করে এবং ধনপতির সম্মুখে কন্যা বিবাহের বিধান চায়। আর সেই সময় ধনপতি বলে —

''এক কথা লক্ষপতি বলি তোমার তরে।
তোমার পিতার পুন্যে কন্যা দান কর মোরে।।''[১৮৭]

এইভাবে ধনপতি ও লহনার কলহ, পায়রা উড়ানো, ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার সাক্ষাৎ, কামদগ্ধ হয়ে নির্লজ্জের মতো লক্ষপতির কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া — সত্যিই পাঠককে বিস্মিত করে। যেন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপই ঘটনাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ধনপতির বিবাহ নিয়ে আর একটি দিকও আমাদের চকিত করে। সে হল মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে লক্ষপতি কন্যার বিবাহ ধনপতির সঙ্গে দেবে কিনা সে বিষয়ে স্ত্রী রম্ভাবতীর কাছে মতামত চাইতে যাওয়া।

''আর বিবাহ করিতে জদি সাধ থাকে তোরে।
আগে জিজ্ঞাসিয়া আসি রম্ভাবতীর তরে।।
রম্ভা য়াজ্ঞা করে জদি কন্যা কর দান।

তবে পণ্ডিত পঠাইয়া দিহ কভু নয় য়ান।।”[১৮৮]

তবে রম্ভাবতীর কন্যার বিবাহ সম্পর্কে মতামত ও ঘটক বা পণ্ডিত পাঠানোর কোন বিবরণ কাব্যে নেই। সরাসরি ঘটক জনার্দন ধনপতির সঙ্গে সাত বছরের বালিকা খুল্লনার বিবাহ দিতে বলে। কিন্তু রম্ভাবতী সতীনের গৃহে কন্যা বিবাহের জ্বালা অনুভব করে নারাজ হলে জনার্দন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থাগুলি তুলে ধরে। সে রম্ভাকে বলে —

“সাত বৎসরের হৈলে ছুত হয়ে নারী।
দশ বৎসর হৈলে পূর্ন কুমারী।।
এগার বৎসর হৈলে চঞ্চল হয়ে চিত।
বার বৎসর হৈলে পুষ্প বিগশিত।।
তোমার খুলুনা হৈল সপ্ত বৎসরে।
এহি সময় বিবাহ দেহ ধনপতির তরে।।”[১৮৯]

সতীন জ্বালার জন্য রম্ভাবতী কন্যার বিবাহে অসম্মত হলেও জনার্দন কথিত এই সামাজিক কঠিন শৃঙ্খলের কথা শুনে মানব চরিত্র হিসাবে আনন্দিত হবার কথা নয়। “শুনিএগ্রাত রম্ভাবতী আনন্দিত হইল।”[১৯০] কাহিনী ধারায় মাতা রম্ভাবতীর কন্যার বিবাহ বিষয়ে এরূপ আচরণ কার্যকারণ সম্পর্ক লঙ্ঘন করেই কবি ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার বিবাহের বিষয়টি দেখালেন। সেই বিবাহের পটভূমিকায় নারীরা অপশাসনের বিরুদ্ধে ও পুরুষ নিন্দার প্রাণোচ্ছল প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কবি বিবাহ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধগুলি সমকালীন শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মধ্যযুগে নারীদের সামাজিক অবস্থানের প্রতি কবি আগ্রহী হওয়া কাহিনী গ্রন্থনা শিথিল করেছেন। ধনপতিকে দেখতে এসে নারীগণের পতিনিন্দায় ধনপতির পরবর্তী দাম্পত্য জীবনের দুর্ভোগের পূর্বাভাস দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে। সেখানে দেখা যায় যে, ধনপতিকে দেখতে যেসকল নারী এসেছিল তাদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ উন্মোচনেই কবির বেশি আগ্রহ ছিল। কবি বলছেন — “জুবা২ রাইহ লইয়া কিছু শুনিব বচন।”[১৯১] এই সকল যুবতী নারীরা ধনপতির মত সুন্দর পুরুষকে দেখে তাদের অন্তরগহনের মানসিক যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার রূপ তুলে ধরেছে। ‘নারীগণের পতিনিন্দা’ এই অংশটি সাধারণত মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা রীতি অনুযায়ী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবখণ্ডে মেনকার খেদ ও শিবের মদনমোহন রূপ ধারণ করার পর বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডে ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার বিবাহের আগে তা বর্ণনা করেছেন। কবি ‘নারীগণের পতিনিন্দা’ অংশটি কাহিনী ধারায় উপস্থাপনে মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসরণ করেছেন এবং তা বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছেন। কবি এই অংশে নারীর সামাজিক অবস্থানকে কাহিনী ধারায় বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ ধরনের নারীদের পতিধিক্কারের উৎস সম্ভবত কবি লোকগান ও লোকছড়া থেকে নিয়ে থাকবেন। এই অংশটিকে নারীর মনস্তাত্ত্বিক ও বিফল জীবনের প্রতিভাস বললে অত্যুক্তি হবে না। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নারীরা তাদের বুড়ো, কালা, কাশো, কুঁজো, কানা, গোদা স্বামীদের নিন্দা করেছে। কবি তাতে অত্যন্ত হাস্যকৌতুকের দ্বারা দুঃখের মেঘের মধ্যে আলোর ঝলক দেখিয়েছেন। কবি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে —

> ‘‘এক জুবতি বলে হের মোর পোড়ে হিয়া।
> কেমোন য়াইল সাধুর বালা দেখি আসি গিয়া।।
> *　　　　*　　　　*
> আর জুবতী বলে প্রিয়া তোর নাপন ভাল।
> কুজগিরির তাপে মোর শরীর কৈল কাল।।
> শুইবার কালেতে কুজা শোয়ে একমনে।
> চিত হৈয়া শুইতে নারে কুজের কারণে।।
> মাঝিয়াত ফেলাইয়া থুইলে থাকে কাইত হৈয়া।
> চিত হৈয়া থাকে কুজা খালে কুজ দিয়া।।
> *　　　　*　　　　*
> এক জুবতী বলে পতির নাই দরশন।
> শাক সুকুটা বিনে না করে ভোজন।।
> একদিন অন্নবেঞ্জন দিড় করি রান্ধি।
> মারয়ে পীড়ার বাড়ি কোনে বসি কান্দি।।
> আর জুতী বলে গোদা মোর পতি।
> কুঞ্জরের ঐষধ আমি সদাই পাব কতি।।
> পথে চলি জাইতে গোদেত লাগে ধুলি।
> দুই গোদ য়াচড়ি করে শামুকের খুলি।।
> তখনি কহিলাম গোদা হুতি হৈয়া শো।
> গোদের চাপনে মৈল ছয়মাসের পো।’’[১৯২]

তিনি যুবতীদের দুঃখের চিত্রের পাশাপাশি ‘রাড়ি’ বা বিধবাদের দুঃখ কষ্টের চিত্র তুলে ধরেছেন। নারীর সামাজিক অবস্থানের চিত্র বর্ণনায় সার্থক বলে মনে হলেও প্লট বা কাহিনী গ্রন্থনার দিক থেকে কাহিনীর অযথা বৃদ্ধি বা কিছু মধ্যযুগীয় তথ্যের সন্ধান ছাড়া অতিরিক্ত নয়। এই তথ্য অনুসন্ধানকে কবি সকল হৃদয়গ্রাহী পাঠকের রস-সম্পদে পরিণত করতে পারেন নি। তবে, কবি

বৃদ্ধা এয়োনারীদের মনোবাঞ্ছা পূরণের চিত্র সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এক বৃদ্ধা বিধবা তার দুই নাতিনীকে ধনপতির কাছে বিবাহ দিয়ে নিজের সখ-আহ্লাদ ও কামনা-বাসনা পূরণ করে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এইভাবে কবি মানিক দত্ত একে একে নারীর অন্তরের জ্বালাময় উত্তাপকে সচেতন ভাবে তুলে ধরেছেন। তার ফলে কাহিনী গ্রন্থনা অনেকটাই শিথিল হলেও নারীদের এরকম পতিনিন্দাকে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের সমালোচনা হিসাবে দেখা যায়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থা সর্বাধিক সঙ্কটজনক। সতীনের গৃহে রম্ভাবতী কন্যাকে বিবাহ দিতে সম্মত হলেও স্বামীগৃহের যন্ত্রণা থেকে রক্ষার জন্য তুক্‌তাকের সাহায্য নিয়েছে। সেই তুক্‌তাকের জন্য এসেছে মালিনী নামে একটি চরিত্র। স্বামীর গৃহে কন্যার যেন কোন সঙ্কট না হয়, তার জন্য পুরুষের কামনাকে তুক্‌তাক দ্বারা খুল্লনামুখী করতে চেয়েছে রম্ভাবতী। মালিনী তাকে আউশ ধানের চাল, চিলের বাসার খড়ি, খুল্লনার ব্যবহৃত চুলের তেল একত্রিত করে চাঁপা কলার মধ্যে দিয়ে খাওয়ালে তাকে স্বামী চিরকাল ভালোবাসবে। রম্ভাবতী কিন্তু সমাজপ্রবাহে অভিজ্ঞতা লাভ করার ফলেই এধরনের পূর্বসচেতনতা অবলম্বন করেছে। সমাজে এধরনের তুকতাক্ বা লোক ঔষধ করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে কবির এই বর্ণনা হয়তো এত সুচারু হত না।

অতঃপর কবি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্দেশিত ভূমিকাকেই খুল্লনার ঋতুদর্শনের পূর্বেই বিবাহ বাধ্যতামূলক — সেটি কারণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে দেবীর স্বপ্নকে একত্রিত করে দিয়েছেন। তার পিছনেও কবি সমাজ কলঙ্কের রক্তচক্ষুর ভয়কেই কাজে লাগিয়েছেন।

> ‘‘ধনপতি সাধুকে জদি কন্যা নাঞিঃ দিবে।
> অবিভাত খুলনার কলঙ্ক হইবে।।
> স্বপ্ন দেখি লক্ষপতিকে ভয় লাগে।
> লক্ষপতি আসি বোলে ধনপতির আগে।।’’[১৯৩]

ধনপতির বিবাহে লহনার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত নারী মনস্তাত্ত্বিক বলে মনে হয়। খুল্লনা একদিকে লহনার খুড়তুতো বোন, অন্যদিকে সে তার তুলনায় সুন্দরী। সুন্দরের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বেশি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী কেবল যৌনভোগের সামগ্রী ও বংশ রক্ষা তথা সন্তান ধারণের যন্ত্র — একথা লহনার অজানা নয়। তার আশঙ্কা সে বিগত যৌবনা এবং বন্ধ্যা। তাই লহনার স্বামীর প্রতি একাধিপত্য অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি, খুল্লনাকে আশির্বাদ করতে লহনাকে পাঠালেও তার নারী মননের ভিতরের রহস্য উন্মোচিত হয়। আশির্বাদে খুল্লনাকে যে সকল অলঙ্কার দেওয়া হয় তাতে অভিজাত বণিক পরিবারের পক্ষে বিস্ময়কর।

আশির্বাদের পর ইছানী নগরে খুল্লনার বিবাহে জল সাধার বিষয়টি পরিবেশিত হয়।

সেখানে কবির কাহিনী গ্রন্থনে দৃঢ়তার পরিচয় না পাওয়া গেলেও সমাজ সচেতন কবি হিসাবে তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। লক্ষণীয়, ইছানী নগর থেকে কয়েকজন এয়োনারী বা সধবা নারীকে জল সাধার জন্য উজানী নগরে পাঠানো হয় এবং কয়েকজন ইছানী নগরে জল সাধতে বের হয়। তাতে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কাহিনীতে চরিত্রের ভীড় লক্ষ্য করা যায়। সেই সকল চরিত্রের নামে সমকালীন পুরাণ প্রভাবিত। যেমন — শিতলি, পাতলি, শাকম্ভরী, সত্যভামা, রোহিনী, দ্রৌপদী, ইমলা, বিমলা, সরস্বতী, কমলা, ইন্দুমতি ও তারা ইত্যাদি। বিবাহের সাধারণ বিষয়ের নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব ছবি কবি অঙ্কন করেছেন। কয়েকটি বাক্যে কবি তৎকালীন সমাজের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন —

"হরি হরি রাইহ জানাও প্রতি ঘরে ঘরে।
শিতলি পাতলি রাইহ সাধুর মন্দিরে জাইহ
জারে তোরা জল সাধিবারে।।
শাকম্ভরী সত্তভামা রোহিনী দ্রৌপদী রামা
সকলের মাথায়ে দুর্গার ঘটবারা।
ইমলা বিমলা সরস্বতী কমলা
ইন্দুমতি আর তারা।।"[১৯৪]

এয়োনারীদের রূপ সজ্জা, তাদের জল সাধতে যাওয়া ও সেই সঙ্গে 'দুন্দুবি' বাদ্য বাজায় লহনার ক্রন্দন, আম্র পল্লব ও কলা সমেত ঘট স্থাপন ও বাম পাশে ব্রাহ্মণের বেদ পাঠ, বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর গৃহে গিয়ে জল সাধা এবং ধনপতির বিবাহে যৌতুক নিয়ে বণিকশ্রেণীর মধ্যে তাদের যৌতুক নেওয়ার আধিক্যের চিত্র কবি বিস্তারিত ও পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে কাহিনী গ্রন্থনের দৃঢ়তায় ব্যাঘাত পড়লেও সামাজিক নিদর্শন হিসাবে তার মূল্য যথেষ্ট। এছাড়া বিবাহে ধনপতিকে নিয়ে খুল্লনার সাতপাক দেওয়া, ঈশ্বরের স্মরণে মালা বদল এবং যৌতুকে দুই জন দাসী প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলি এ বিষয়ে লক্ষণীয়।

"স্বামীকে বেড়িয়া রামা সপ্তপাক দিল।
হরিধ্বনি দিঞা মালা গলে তুলি দিল।।
বিবাহ করিল তবে সাধুর নন্দন।
দানে জৌতুকে বসিল দুইজন।।"[১৯৫]

অভাবনীয় ঘটনা পরিস্থিতির সম্মুখীন করে কবি বিবাহের পর খুল্লনাকে শ্বশুর গৃহে যাত্রার প্রাক্কালে রম্ভাবতী চরিত্র দ্বারা সাংসারিক আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই সামাজিক তথা পারিবারিক অভিজ্ঞতা রম্ভাবতী কন্যা খুল্লনার মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। কবি তাঁর তিক্ত সামাজিক

তথা পারিবারিক সংবিদকে রম্ভাবতীর মাধ্যমে এখানে উন্মোচিত করেছেন। কবি নিজে বর্ণনা দিয়ে কিছু বলেন নি, ঘটনাচক্রের মধ্যবর্তী করে সবই স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছেন। তা রম্ভাবতীর অশ্রু সজল নয়নে কন্যাকে পিত্রালয় থেকে বিদায়ের প্রাক্ মুহূর্তে ফুটে উঠেছে। ধনপতি গৃহে ফিরে সকল জ্ঞাতিসহ অন্যান্য যুবতীদেরকে ভোজন করিয়ে সঙ্গে প্রণামি স্বরূপ অর্থ প্রদান করে। বলাবাহুল্য, এরূপ একটি সামাজিক রীতির আভাস এখানে রয়েছে বলে মনে হয়।

এরপর কাহিনীতে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরের সঙ্গে ধনপতির সাক্ষাৎ করতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। তাতে ধনপতি রাজার ঘরের বিছানায় বসার মধ্যে, বণিক শ্রেণী ও রাজার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সমতুল্যের বাস্তব ছবি উঠে এসেছে। সে যাই হোক, এই দ্বন্দ্বের পূর্বসূত্র নিহিত ছিল বিক্রমকেশর কর্তৃক ধনপতিকে আঁটকুড়া অপবাদের মধ্যে। তার শ্লেষাঘাতে ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহ। সেই সঙ্গে রাজা হিসাবে বিক্রমকেশরকে জ্ঞাত না করলে তার আত্ম অহমিকা জাগ্রত হয় এবং তাতে বিক্রমকেশর ধনপতিকে বন্দী করে।

''রাজা বোলে বিভা কৈলে শুন সদাগর।
আমি রাজ্যের রাজা না পাল্যাঙ খবর।।
বিক্রমকেশর রাজা মনে ক্রোধ হল্য।
ধনপতি সাধুকে রাজা বন্দি করি থুল্য।।''[১৯৬]

ধনপতি ও বিক্রমকেশর চরিত্রের দ্বারা দ্বান্দ্বিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং কাহিনীতে গতি সঞ্চারে সাহায্য করেছে। তবে ধনপতি বন্দী হওয়ার পর কাহিনীতে লহনা ও খুল্লনা চরিত্রের হঠাৎ করে অনুপ্রবেশ ঘটে। এই অংশটুকু ধনপতির বন্দী দশার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও সতীন সমস্যার সামাজিক রূপটি স্বল্প পরিসরেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কাহিনীর গতি মুখ পরিবর্তনের জন্য সন্নিবেশিত হয়েছে একটি উপকাহিনী। সেই জন্য হঠাৎ কৈলাশে দেবী চণ্ডী কীভাবে খুল্লনাকে দিয়ে ছাগল চরাবে সেই পরিকল্পনায় চিন্তিত। তবে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চিন্তা ও তার উপায় স্বরূপ শারী-শুয়া পাখির জন্ম কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত বলে মনে হয়।

''কিরূপে চরাবে ছেলি সুন্দর খুলনা।
এই কথা দুর্গা মাতা করিছে মন্ত্রনা।।
পদ্মা বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
অখন করাহ শারী শুকের জনম।।''[১৯৭]

দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্য তার ব্রত প্রচার। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খুল্লনার মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ। সেই

উদ্দেশ্যকে সাধন করতে শারী শুকের জন্ম। শারী-শুয়া পাখিকে মূল কাহিনীর গতিমুখ ও প্রধান চরিত্রদেরকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য উপকাহিনী হিসাবে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে।

শারী-শুয়া পাখি কীভাবে মূল কাহিনীতে এল তার জন্য কবি একটি উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। তাতে অলৌকিক ঘটনা অধিক স্থান পেলেও কাহিনীবৃত্ত কার্যকারণ সম্পর্কহীন নয়। শারী-শুয়াকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের জন্য কাহিনীকে মর্ত্য থেকে স্বর্গে নেওয়া হয়েছে। তার পটভূমি ঐ ইন্দ্রের রাজসভা। শারী ও শুকের পূর্বে নাম ছিল পুষ্পদত্ত ও বিদ্যামন্ত। তারা স্বর্গেই মর্তের রামগুণ গান গায়। সেই গান শুনে শচী রাণীর চিত্ত মুগ্ধ হয়ে যায় এবং হৃদয় শান্তিতে ভরে উঠে। বাঙালী বধূর মত মুগ্ধতার পরিচয় রয়েছে স্বর্গের রাণী শচীর মধ্যে। তৎকালীন মধ্যযুগে রাম নামের ব্যাপক প্রসার ও রাম দেবতা রূপে সর্বজন স্বীকৃত পায়। সেই দেবতার গুণগানে অধম পাপিষ্ঠের হাস্যকৌতুক জনিত অভিশাপ তৎকালীন লোকবিশ্বাসকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। রামগুণ গানের মুগ্ধতায় তাদের হাসিই অভিশাপের কারণ এবং মর্ত্যে দ্বাদশ বৎসরের জন্য পাখিরূপে জন্মগ্রহণ।

"গানে মগ্ন শচী ইন্দ্রের বুকে হস্ত দিল।
দেখিঞা নিত্তকী দুহে হাসিতে লাগিল।।
নিত্তকির হাস্য দেখি ইন্দ্র ক্রোধ হৈলো।
শচী দিল বুকে হস্ত দেখিঞা হাসিলো।।
ক্রোধে ইন্দ্র শাপ দিঞা বলে নিত্তকীরে।
শারী শুয়া পক্ষ হঞা জন্ম মর্থপুরে।।"[১৯৮]

কবি এই ঘটনাটির সঙ্গে অপর একটি কাহিনী যুক্ত করে দিয়েছেন ইন্দ্র চরিত্র সংযোগের দ্বারা। সেই কাহিনীতে পুরাণ পরিচিত কিছু ঘটনা ও চরিত্রের সন্নিবেশ হয়েছে। তার ফলে মূল কাহিনীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন নতুন উপকাহিনী ও ঘটনা ধারা সৃষ্টি হয়েছে। যে ঘটনাগুলি সমকালীন শ্রোতাদের কাছে হয়তো মুখরোচক ও মনোরঞ্জনের বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে শিল্পের দিক থেকে তার মূল্য কম। ইন্দ্র বলেছে সেই পুরাণের শ্রীবৎস রাজার কথা। শারী-শুয়া প্রথমে শ্রীবৎসরাজার ঘরে থাকবে সেখানে কীভাবে শনির দৃষ্টিতে অরণ্যে যাবে তার বিবরণ। কবি এই পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক কাহিনী যুক্ত করে দিয়েছেন। অরণ্য থেকে ব্যাধের দ্বারা রাজা বিক্রমকেশরের রাজদরবারে অবস্থান করবে। এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তার আবার ব্যাখ্যা বিবৃত হয়েছে। শারী শুক পাখি কীভাবে শ্রীবৎস রাজার গৃহে গেল তার সূত্র কাহিনীতে বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে —

"শ্রীবৎস রাজার গৃহে দুই পক্ষ গেল।
পক্ষ পাঞা মহারাজা পালিতে লাগিল।।"[১৯৯]

সেখানে শনি সন্ন্যাসী রূপে ভিক্ষা করতে আসে। কিন্তু রাজা শ্রীবৎস একাদশীর কারণে শারী পক্ষকে দিয়ে ভিক্ষা প্রেরণ করে। রাজা নিজে ভিক্ষা দিতে না আসায় শনি রাজাকে কামবাণ নিক্ষেপ করলে তার একাদশীর ব্রত ভঙ্গ হয় এবং সে নারী সঙ্গম করে। কবি মানিক দত্ত শনি সম্পর্কিত লোকপ্রচলিত ধারণাকে এখানে কাজে লাগিয়েছেন। শনির দৃষ্টিতে সমস্ত ধনসম্পত্তি বিনাশ হয়ে যায় — লোকসমাজে প্রচলিত এই বিশ্বাস শ্রোতা ও পাঠকের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। কবি এই লোক বিশ্বাসকে রাজার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন এই ভাবে —

> ‘‘চক্ষু তুলিয়া রাজা জেই দিগে চায়।
> রাজার পাপে ধনলক্ষ্মী ছাড়িয়া পলায়।।
> ধনলক্ষ্মী পলাইছে রাজা মনে ভাবে।
> রাজ্যে থাকিলে আমার প্রজা নষ্ট হবে।।’’[২০০]

এই কারণে রাজা শ্রীবৎস ও রাণী চিন্তাবতী শারী-শুয়া পাখিসহ ধনসম্পত্তি নিয়ে রাজ্য ছেড়ে যাত্রা করে। শ্রীবৎসের এরূপ আচরণ তাকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়েছে। এবার যাত্রা পথে শনির ছলনা দ্বারা তার উদ্দেশ্য বাধা প্রাপ্ত হয়। শনি নদীর ধারে খেয়া পারাপারের মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং তার ছলনায় রাজা সমস্ত ধন-সম্পদ হারায়। শ্রীবৎসের এই কাহিনীর সঙ্গে সুধীরচন্দ্র সরকার-এর ‘পৌরাণিক অভিধান’-এর বিবৃতির মিল রয়েছে। তিনি সেখানে বলেছেন — ‘‘একদিন শ্রীবৎস আহারের পর পাদ প্রক্ষালন করতে ভুলে গেলে, সেই রন্ধ্রের সাহায্যে শনি তাঁর দেহে প্রবেশ করেন। শনির প্রভাবে শ্রীবৎস দিন দিন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ক্রমে রাজ্য ভ্রষ্ট হন। অবশেষে এক কাঁথার মধ্যে রত্নরাজি বেঁধে সস্ত্রীক রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পথে শনি এক মায়া-নদী সৃষ্টি করে স্বয়ং একটি জীর্ণ নৌকা নিয়ে উপস্থিত হন। নৌকাটি অতি জীর্ণ হওয়ায় এবং একটির অধিক জিনিস তাতে বহন করা সম্ভব নয় বলে শ্রীবৎস প্রথমে কাঁথায় জড়ানো রত্নরাজি নৌকায় তুলে মাঝিকে সেটি অন্য পারে রেখে আসতে বলেন। শনি সেই কাঁথা সমেত নৌকা করে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নৌকা সমেত অদৃশ্য হয়ে যান।’’[২০১] সেই দুঃখে শ্রীবৎস শারী শুয়া পাখিদুটিকে ছেড়ে দেয়।

অর্থাৎ শারী-শুয়া পাখিদুটিকে রাজা শ্রীবৎসের ঘর থেকে বনে আনার জন্য শনি সম্পর্কিত লোক বিশ্বাসকে কাজে লাগানো হয়েছে। বন থেকে তাদেরকে উজানী নগরের রাজদরবারে পৌঁছে দেবার জন্য উতু-পাতু নামে দুই ব্যাধকে নিয়ে কাহিনীর অবতারণা ঘটানো হয়েছে। তাদের কথা বলা হয়েছে এভাবে —

> ‘‘পক্ষকে ধরিবে ব্যাধ কথা শুন তার।।
> উতুপাতু নামে ব্যাধ দুই ব্যাধ ছিল।

পক্ষ মারিতে দুহে সাজিতে লাগিল।।"[২০২]

কাহিনী স্তিমিত প্রায় অবস্থায় উতু-পাতু ব্যাধ দ্বারা ঘটনা অগ্রসর হয়েছে। তাদের শিকার-জীবনের ছবি কবি বাস্তব জীবন থেকে তুলে এনেছেন, বলে মনে হয়। তা নিতান্তই বিশ্বাসযোগ্য। কবি তার ছবি তুলে ধরেছেন সুন্দর ভাবে —

"পক্ষ মারা ফাস নিল পক্ষ মারা নল।
নলের উপরে ব্যাধ বান্ধি দিল কল।।
পক্ষ মারা যত কল সঙ্গে করি নিল।
পক্ষ মারিতে ব্যাধ অরন্যেতে গেল।।
দুই ভাই উড়া ফাস অরন্যে পাতিল।
ফাসতে চাউল খই ছিটাইঞা দিল।।
পক্ষ সব ফাসতে আহার খাইতে আইল।
ফাসে বন্দী করি ব্যাধ পক্ষ সব ধল্য।।"[২০৩]

শারী পাখি ব্যাধের শিকার কৌশল দেখে আত্মসমর্পণ করে। শুয়া পাখি তখন ব্যাধকে রাজ-স্থানে নিয়ে যেতে বলেছে। তারপর কবি ব্যাধদ্বয়ের বিভিন্ন পাখি বিক্রয়ের মাধ্যমে বিচিত্র পাখির নাম উল্লেখিত হয়েছে। সেই পাখিগুলি নগরের অভিজাত মানুষদের কাছে সখের জিনিস আর ব্যাধের কাছে তা জীবিকা নিবারণের বস্তু মাত্র। কড়ির দ্বারা পাখি বিনিময় প্রথা সমকালের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিনিময় প্রথার ব্যঞ্জনা বহন করে। ব্যাধদের পাখি বিক্রয়ের সম্পর্কে আমরা নীহাররঞ্জন রায়-এর মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — "নিম্নতম মান কড়ি সব সময়ই ছিল, এবং ছোটখাটো কেনাবেচায় ব্যবহারও হইত ...।"[২০৪] পাখি বিক্রয়ের কড়ির হিসাবের সুন্দর পরিচয় কবি মানিক দত্ত দিয়েছেন। পণ দড়ে (৪ বুড়ি = ১ পণ) ঘুঘু ১১/২ বুড়িতে, দশ গণ্ডায় (৫ গণ্ডায় = ১ বুড়ি) বক, তোতা ময়না ৪ পণে এবং ১২ গণ্ডায় সারোশ ও বালী হাস বিক্রি করে মোট কড়ি হয় সাত কাহন বা 'কর্ষ'।[২০৫] অর্থাৎ , পাখি বিক্রয় মূল্য ১১২ পণ।[২০৬] এই সকল বিনিময় প্রথার রীতি ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান।

সে যাই হোক, এরপর পৌরাণিক সংস্কার ও লোকসাহিত্যের উপাদান কাহিনী গ্রন্থনায় ফলপ্রসূ হয়েছে। ব্যাধ অন্যান্য সকল পাখি বিক্রয়ের পর শারী-শুয়া পাখি নিয়ে রাজা বিক্রমকেশরের সম্মুখে উপস্থিত হলে তাদের বাক্‌পটুতা ও নানারকম প্রহেলিকা বা শ্লোক অবলম্বনে লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান উঠে এসেছে। যেমন —

(১) "মরন হুতাশে তার জীবন প্রকাশে।
হস্ত পদ নাই তার সভা মধ্যে বৈসে।।

একমুখে উগারএ আর মুখে খায়।
বুঝ২ পণ্ডিত হিয়ালি সভায়।।''[২০৭]

(২) ''হস্ত নাই পদ নাই পর হস্তে চলে।
তাহাকে দেখিয়া কামিনীগণ ভুলে।।
বুকে চিয়াড় বীরের পিষ্টে আছে কুজ।
বুঝ২ পণ্ডিত হিয়ালির বুজ।।''[২০৮]

(৩) ''সাগরে জনম তার নগরে বিকায়।
জন্ম অবধি তাকে নাই ছএ মাএ।।
শুন২ পণ্ডিত কথা অদ্‌ভূত।
মাএ ছোইলে তার মরি জায় পুত।।
শোলক বলিল পক্ষ বুদ্ধি প্রবন্ধ।
শোলক শুনি সকলিকে লাগি গেল ধন্দ।।''[২০৯]

এরূপ মোট আটটি শ্লোকের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর শারী-শুয়া নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচয় প্রদান করে। ব্রাহ্মণ হত্যা ব্রহ্ম হত্যার সমান — সেই কথা মধ্যযুগের সমাজে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর প্রাধান্য প্রবল মাত্রায় প্রকট করে। শারী-শুয়ার হত্যা প্রসঙ্গে এই কথাটি অসঙ্গত নয়। মানিক দত্ত ভারতীয় সংস্কারের ঢঙে শারী-শুকের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য করে তুলেছেন। তারা ভারতীয় সংস্কারে দ্বিজরূপে পরিচিত। প্রসঙ্গত, আমরা নির্মলেন্দু ভৌমিকের একটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি — ''অনেক পাখিই বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা অর্জন করলেও শুক-পাখিই ভারতীয় জীবনে ও সংস্কারে এ বিশেষ প্রধান স্থান নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার এদেশে দৃঢ়মূল হয়ে উঠলে সেই সংস্কারের বশে শুক পাখিকে 'দ্বিজ' বা ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল, 'ব্রাহ্মণ' ভারতীয় সংস্কারানুযায়ী পণ্ডিত ও বিদ্বান।''[২১০] এই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে কবি কাহিনীর গতিমুখ পরিবর্তনে কাজে লাগিয়েছেন। এছাড়াও তারা রাজাকে তাদের প্রতি বিশ্বাস ভাজনের জন্য চার যুগের সাক্ষী সম্পর্কে সম্যক পরিচয় প্রদান করেছে। সেই সঙ্গে এসে যায় সমকালের গৌড়ের মুসলমান শাসকের বাস্তব কথা। শারী শুয়ার কথায় —

''পক্ষ বলে বলি আমি চারি যুগের বানী।
রাজা বলে বল পক্ষ সেই কথা শুনি।।
রাজার কথা শুনি শুয়া বলিতে লাগিল।
শুন রাজা প্রথমতে সত্য যুগ হৈল।।
সত্য যুগে রাজা হৈল শতেক বচ্ছর।

ছত্র রাজ্যতে হৈল ছত্র নৃপবর।।
ত্রিতীয়া যুগতে রাম অবতার হৈল।
রাবণে মারিয়া রাম সীতা উধ্বারিল।।
দ্বাপর যুগতে হৈল কৃষ্ণ অবতার।
গোকুলে জন্মিল কৃষ্ণ কংস বধিবার।।
কলিযুগে হইল মেলচ অবতার।
গৌড়রের রাজা হৈল জোবন অধিকার।।
আনন্দিত হৈল রাজা পক্ষের কথা শুনি।
গাইল মানিক দত্ত ভাবিয়া ভবানী।।"[২১১]

মানিক দত্ত লোকপ্রচলিত শ্লোক প্রহেলিকা এবং সমাজসত্যকে একত্রে কাহিনীর গতিমুখ পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, ধনপতিকে শারী-শুয়ার জন্য স্বর্ণ পিঞ্জর তৈরী করাতে গৌড়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা কাহিনী গ্রন্থনায় ভারসাম্যহীন নয়। রাজা বিক্রমকেশর ধনপতির অনুপস্থিতিতে তার সুন্দরী নারীকে ভোগ করবে — একথা ভেবে ধনপতি তাকে অভিযোগ করা মধ্যযুগের বাতাবরণে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সে যে পরম পবিত্র, সৎ ও ভোগী নয় এবং অন্যের নারীর প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা-সম্মান রয়েছে। একথা বোঝাতে পবিত্র রাম নাম উচ্চারণের সংস্কার ও বিশ্বাস অনিবার্য ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। রাজার মুখে একথা শোনার পর ধনপতি গৌড়ে যেতে রাজি হয়। রাজাদেশে নববিবাহিত স্ত্রী খুল্লনাকে লহনার কাছে রেখে ধনপতির গৌড় যাত্রা — নবসংসার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হল। এটি কাহিনী গঠনের দিক থেকে নায়কের অনুপস্থিতি বলা যেতে পারে।

ধনপতির অনুপস্থিতিতে কাহিনীতে এসেছে নতুন বিপদ। সেই বিপদ খুল্লনার। লহনা তা সৃষ্টি করে। সেই জন্য কাহিনীতে নিলাবতী নামে এক চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। লহনা দুর্বলা দাসী দ্বারা সেই নিলাবতী ব্রাহ্মণীকে ডেকে আনে। তার কারণ খুল্লনা রূপে ও যৌবনে অটুট। তাই খুল্লনার প্রতি স্বামীর মন সম্পূর্ণ আবদ্ধ। বিগত রূপ-যৌবন নারীর কাছে রূপ-যৌবন যুক্ত নারীর প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শনে লহনা উপযুক্ত জীবন্ত নারী চরিত্র রূপের প্রকাশ পেয়েছে। যৌবন-কামনা এবং সন্তান-কামনা — পিতৃতন্ত্রের এই দুটি দাবী পূরণে সে অসমর্থ। তাই তাকে কবি নিতান্ত সমাজ বাস্তব অভিজ্ঞতায় অঙ্কন করেছেন। সে নিলাবতীকে বলেছে —

"লহনা বলিছে সই শুন দুঃখের বাণী।
খুলনা বহিন হঞা হইল সতিনী।।
জোবন রহিল মোর রূপ হৈল হীন।

দুঃখের উপরে দুঃখ দারুণ সতীন।।
রূপহীন দেখি মোকে ছাড়িবেন পতি।
খুলনাকে নঞা সামী ভুঞ্জিবে সুরতি।।"[২১২]

এখানে খুল্লনার রূপ-যৌবনের প্রসঙ্গই বড়ো। তা লহনাকে আতঙ্কিত করে। বিগত-যৌবনা লহনা তার কামনার পুরুষকে পাওয়ার জন্য নিলাবতীর কাছে বশীকরণের উপাদান চায়। নিলাবতী বশীকরণের যেসব উপাদান সংগ্রহের জন্য বলেছে তা লোক বিশ্বাস বা তুক্‌তাক্ সম্পর্কিত। নিলাবতী লহনাকে হাট থেকে একমূল্যের বাতি, শ্মশানের সরিষা, ভরা হাটের এক মুঠি ধূলা, প্রথম হাটের গুয়া পান, প্রথম অন্ন খাওয়ার ধান, খঞ্জনা পাখির হাড় ও তার অঙ্গের মল, সাত কূপের জল, তেপথির ধূলা সমেত অন্নে খাওয়ালে স্বামী তাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসে। শুধু স্বামী বশ করা নয়, খুল্লনার রূপ-যৌবন হরণ করার জন্যও তুক্‌তাকের বিবৃতি রয়েছে। তাতে লৌকিক জীবনে বশীকরণের কৌশল বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত। তা কাহিনীকে সজীবতা দান করেছে। মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ গবেষক অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন — "লহনা খুল্লনাকে অপদস্থ করার জন্য এবং স্বামীর হৃদয় জয় করার জন্য নানারকম তুক্‌তাকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই পরিবেশের মধ্যে কবি যেন অবাক বিস্ময়ে তাঁর সমকালীন মানুষকে দেখেছেন; আর তাঁর সমাজকে, সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক আচরণকে কলমের আঁচড়ে সজীব করে তুলেছেন।"[২১৩] মুকুন্দ চক্রবর্তীর সম্বন্ধে এই অভিমত মানিক দত্তের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য।

তারপরই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এসেছে চিঠির উপাদান। সাধারণত হৃদয়ের কথা স্পষ্ট করে জানাতে, অনুপস্থিত চরিত্রের মনোভাব জানানোর জন্য, সংকটে পড়ে বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের কাছে পরামর্শের জন্য চিঠিপত্রের ব্যবহার ঘটে। কিন্তু এখানে এই চিঠি এক ষড়যন্ত্রের উপায়। নিলাবতী ও লহনা ধনপতির নাম করে মায়াপত্র দ্বারা খুল্লনাকে দিয়ে ছাগল চরাতে, খুদের চালের ভাত খেতে, রাতে ঢেঁকিশালায় শুতে ও পোড়া ভাত খেতে আদেশ দেয়। এই সকল মিথ্যা ষড়যন্ত্র হলেও মধ্যযুগে নারীদের চিঠি লেখার রীতি ও 'স্বস্তি' বা মঙ্গলকামনা করে চিঠির সূত্রপাত করার রীতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন —

"স্বস্তি য়াগে লেখিয়া লেখিল ধনপতি।
সকল মঙ্গলা লয় লহনা যুবতি।।"[২১৪]

চিঠির উপাদানের মধ্যেই চণ্ডীর পূর্ব ইচ্ছা নিহিত রয়েছে। দেবীর পূর্ব পরিকল্পিত ইচ্ছার সঙ্গে লহনা-নিলাবতীর কপটতা যুক্ত চিঠি অত্যন্ত কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। তবে এই কপটতা খুল্লনার কাছে ধরা পড়ে যায়। ব্যর্থ পরিকল্পনায় লহনা খুল্লনাকে মারধর করে। তা দেখতে বণিকের স্ত্রীরা এলে লহনা তাদের পুত্রের মাথা খাওয়ার অভিশাপ করে। তাই তারা চলে

যায়। তাতে গ্রাম্য একটি ছবি ভেসে ওঠে। এখানে সাধারণ জনজীবনের সতীন সমস্যার প্রত্যক্ষ ছবি লহনা কর্তৃক খুল্লনাকে দৈহিক অত্যাচারে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এছাড়া সতীন সমস্যায় লহনা খুল্লনার সমস্ত গহনা কেড়ে নেওয়ার মধ্যে নারীর প্রতি নারীর নির্মমতার দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে।

খুল্লনার এই ভাগ্য বিপর্যয়ে স্বাভাবিক ভাবে তার পিতা-মাতার কথা মনে পড়া কাহিনী গ্রন্থনায় কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। সমকালের পিতা-মাতাদের কন্যার দুর্ভাগ্যে পাশে দাঁড়ানোর মত আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও সামাজিক বন্ধন-প্রথায় তারা পেরে উঠত না। খুল্লনার কথায় তার চরম সত্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। লহনার অত্যাচারে খুল্লনা দুর্বলা দাসীকে প্রেরক হিসাবে পাঠালেও রম্ভাবতীর কন্যার দুঃখে দুখী হওয়া ছাড়া প্রথাভঙ্গের শক্তি তার মত নারীর ছিল না। তাই পুত্র হরিবাণ্যার দ্বারা কন্যার জন্য অলংকার বনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাদের সাহস হল না খুল্লনাকে বাপের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বা প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করতে। বিবাহের পর নারীর একুল ওকুল দুকুল বিচ্ছিন্ন পুতুলে পরিণত হতে হয়। কবি তার দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে পাঠক ও শ্রোতাদের সহানুভূতিকে সঙ্গী করে তুলেছেন।

খুল্লনার প্রতি লহনার অত্যাচার স্বর্গ থেকে চণ্ডী লক্ষ্য করে তার সঙ্গে সে ছাগল লুকানোর ছলনা করে। খুল্লনাকে তার ব্রতদাসীতে পরিণত করার ক্ষেত্রে এই ছলনা অনিবার্য ছিল। সেই জন্য দেবী হনুমানকে দিয়ে সেজানু পর্বতে খুল্লনার সকল ছাগল লুকিয়ে রাখে। তন্দ্রাবস্থায় দেবী চণ্ডী ভ্রমরার বেশে তার কানের সামনে রাম গুণগান গায়। সে তা শুনে জেগে ওঠে। রাম গুণগানের সঙ্গে সেকালের মানুষের জীবন সম্পর্কে দ্যোতনা এখানে পাওয়া যায়। রামকথা সেকালের মানুষের সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার সঙ্গে জড়িত ছিল। নিদ্রা ভঙ্গের পর স্বাভাবিক ভাবে খুল্লনার মনে হয় তার ছাগল মঙ্গলবারে হারায়। কারণ তার ছাগল কালী পূজার বলির জন্য কেউ নিয়ে গেছে, তা ভাবা সমকালীন পরিবেশে অসম্ভব নয়। খুল্লনার এই ভাবনার মধ্যে তন্ত্রের শক্তিদেবীর পূজার ইঙ্গিত রয়েছে। তন্ত্রের পাশাপাশি দেবীর ব্রতাচারের সূত্রও পাওয়া যায়। খুল্লনা যে দিকে যায় সেই দিকেই হিংস্র পশুরা তাকে দেবীর ব্রতদাসী বলে সমাদর করেছে। এমনকি দক্ষিণ দিকে ছাগল তল্লাসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পঞ্চ বিদ্যাধরীর। এই পাঁচজন নারী বটগাছের নিচে ধূপ দীপ নানা নৈবেদ্য সহকারে দেবীর পূজা করছে এবং সেইসঙ্গে ব্রতের গান পরিবেশিত হয়েছে। এই ব্রতাচার প্রাচীন কালের। কবি তার চিত্র সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন —

> ‘‘দক্ষিণে খুলনা গেল ছেলি তল্বাসিতে।
> তথা দেখা হৈল পঞ্চবিদ্যাধরি সাতে।।
> বটবিক্ষ তলে আল্য খুলনা সুন্দরী।

দুর্গাপূজা করে তথা পঞ্চ বিদ্যাধরী।।
ধূপ দীপ নানা দ্রব্য নবিদ্য সাজাঞা।
করিছে দুর্গার পূজা আনন্দিত হঞা।।
পূজা করি পঞ্চবিদ্যাধরী গায় গীত।
দেখি খুলনা নারীর মজি গেল চিত।।''[২১৫]

নারীদের বটবৃক্ষের নিচে এই পূজা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত বলে মনে হয়। কেননা দেবীর ব্রতদাসী বলে খুল্লনাকে কেউ অমঙ্গল করল না। আবার দেবীর ব্রত করার জন্য খুল্লনা সরোবরে স্নান করতে গেলে সেখানে জল শূন্য হয়ে যায়; কিন্তু দেবীর 'অঙ্গুরী' তথা আশীর্বাদ নিয়ে গেলে সরোবরে পূর্বের ন্যায় জল পূর্ণ হয়ে যায়। দেবীর ব্রতপালনে এইরূপ অলৌকিক মায়া প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি ব্রত পালনের ফলেই চণ্ডী তার ছাগল ফিরিয়ে দেবার জন্য মর্ত্যে ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে আগমন করে। তার পূজায় তুষ্ট হয়ে দেবী ব্রাহ্মণী রূপ থেকে দশভূজা রূপ ধারণ করে। এখানে খুল্লনার ছাগল হারানো ও উদ্ধারে দেবীর এই মিশ্ররূপের প্রকাশ। প্রথমে সে অনার্যের তন্ত্র দেবী কালী; আবার সে হারানো প্রাণীর উদ্ধারকারিণী ও ব্রতচারিণী দেবী। এই নিম্নশ্রেণীর দেবীই আবার ব্রাহ্মণী বেশ ধারণ করে। এখানে নিম্নশ্রেণীর দেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে মিলনের আভাস মিলে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন — ''পার্বতী উমার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াই ব্রাহ্মণ্যধর্মে তাঁহার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ বলিয়া মনে হয়।''[২১৬] এই পার্বতীর সঙ্গে দেবীর মাতৃরূপ ও ভয়ঙ্কর রূপ মিলিত হল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন — ''উমাকে প্রথমে পাইলাম কন্যারূপে — বহুশোভমানা হৈমবতী-রূপে; তাহার পরে পাইলাম শিবপ্রিয়া-রূপে — তাহার পরে পাই গণেশ-জননী ও কুমার-জননী-রূপে। তাহার পরে যখন লক্ষ্মী-সরস্বতীও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করিয়া মায়ের কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন তখন মায়ের সোনার সংসারকে পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলাম। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই পার্বতী উমার প্রেমময়ী পত্নীত্ব এবং অনন্ত-স্নেহময়ী মাতৃত্বের রূপই প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে; শিবের সহিত প্রণয়-কলহ বা গৃহ-কলহ ব্যতীত মায়ের ভ্রুকুটিকুটিল মুখ কখনও বড় একটা দেখা যায় নাই — অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ ত দূরের কথা। কিন্তু মহাদেবী যখনই ভয়ঙ্করী — রণোন্মাদিনী অসুরনাশিনী — তখনই তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। মায়ের এই অসুরনাশিনী মূর্তির সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত হইল মায়ের চণ্ডী-রূপ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, দেবীর এই অসুরনাশিনী চণ্ডী বা চণ্ডিকার ধারা মায়ের পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি পৃথক্ ধারা। পরবর্তী কালে দুই ধারা নির্বিশেষে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।''[২১৭] দেবী চণ্ডীর মিলিত সংস্কৃতি রূপই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়। দেবী চণ্ডীর দশভূজা-রূপ দেখানোর পর খুল্লনাকে পুনরায় সকল ছাগল ফিরিয়ে দেয়। খুল্লনার কষ্টের জন্য দেবী লহনাকে প্রাণ ভয় দেখায়। সেই ভয়ে লহনা

বন থেকে খুল্লনাকে গৃহে ফিরিয়ে আনে। লহনা খুল্লনাকে তোষামোদ করে বাঙালীর বিভিন্ন প্রিয় খাদ্যবস্তু রন্ধন করে দেয়।

পুনরায় খুল্লনা সংসারে প্রবেশ করলে কাহিনীতে প্রধান চরিত্র ধনপতির প্রয়োজন হয়। সে কারণে প্রথমে খুল্লনাকে দেবী চণ্ডী কর্তৃক ধনপতির রূপ ধারণ করে তার যৌবনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা এবং খুল্লনার মনে স্বামীর অনুপস্থিতি অনুভব করানো হয়। খুল্লনার মনে ধনপতির প্রতি প্রেম ভাবনা জাগ্রত করার জন্য কাহিনীতে দেবী কোকিলরূপে বসন্তের মিলনোচ্ছ্বাস জাগ্রত করে। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে —

“কোকিলের রূপ ধরি দুর্গা গান করে।
প্রিয়২ বলি গান করে উচ্চস্বরে।।
কোকিলের গান শুনি সুন্দর খুলনা।
স্বামী২ বলি কান্দে করিঞা খুলনা।।”[২১৮]

খুল্লনার বার্তা গৌড়ে ধনপতির কাছে পৌঁছে দেবার জন্য দেবীর কোকিল রূপ থেকে শ্বেত কাকে পরিণত হওয়া পরিস্থিতি সাপেক্ষ। কারণ শ্বেত কাক শুভ বার্তার পরিচায়ক। দেবী চণ্ডী খুল্লনার বধূরূপধারণ করে ধনপতিকে স্বপ্ন দেখায়। এই অলৌকিক স্বপ্ন ধনপতিকে উজানীতে আসতে বিচলিত করলেও তার মধ্যে নারীর একটি স্বতন্ত্র সামাজিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। খুল্লনারূপী দেবী চণ্ডী ধনপতিকে হুমকী দিচ্ছে যে সে যদি দু'একদিনের মধ্যে না আসে তাহলে তার বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যার অপবাদ দেওয়া হবে। বিবাহের পর নারী নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের বিপক্ষে ও স্বামীর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে একান্ত বিরল সংযোজন বলে মনে হয়।

অতঃপর কাহিনী গ্রন্থনার পারম্পর্য অনুসারে ঘটনার সঠিক সমাবেশ রক্ষায় কবি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবে কাহিনী ধারায় ধনপতি গৌড়ের রাজা ধনেশ্বরকে ‘পঞ্জর’ তৈরীর জন্য অনুরোধ জানায়। পঞ্জর তৈরীর আয়োজন ও তার কাঠামো দেখে তা পাখির জন্য বলে ভ্রম হয়। মনে হয় পাখির নামে মানুষের জন্য তৈরী কোন পরিকল্পিত গৃহ। তৈরীর বর্ণনা দেখলেই তা বোঝা যায় —

“পক্ষ শুইবার ঘর ধোপ রাখে থরেথর
পক্ষের গড়িল সেতখানা।।”[২১৯]

ধনপতির যাত্রায় গৌড়েশ্বর তাকে ফিরে যেতে দিতে চাচ্ছে না। ধনপতির এতদিন গৌড়ে সংসার ছেড়ে থাকার কারণ বর্ণিত হয়েছে। ধনপতি রাজাকে বলে — “নাটগীতে আনন্দে রহিলাম গৌউড়তে।।”[২২০] তার চরিত্রানুযায়ী এরূপ কারণ নির্দেশ সঙ্গত ও স্বাভাবিক হয়েছে। তাই এখন ধনপতি তার সুন্দরী স্ত্রীর রূপে অনুরক্ত হয়ে ফিরে যেতে চাইছে। তখন অত্যন্ত কৌশলে কবি

রাজা ধনেশ্বরের মুখ দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক আর্য সমাজে চিরকালীন নারীর অবহেলিত ভোগ্য বস্তুর চিত্রটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিন্তু কাহিনী ধারার অনিবার্য স্রোতে ধনপতিকে ফিরে আসতে হল উজানী নগরে। পিঞ্জরের স্পর্শে শারী-শুয়ার মুক্তি ঘটে। মর্ত্য থেকে তাদের এই মুক্তি বারো বছর সময় সীমা অতিক্রমকে চিহ্নিত করে না। এমনকি ধনপতিও গৌড়ে গিয়ে নববিবাহিত স্ত্রী খুল্লনাকে রেখে বারো বছর থাকা অস্বাভাবিক বটে। এ ধরনের অস্বাভাবিক কাহিনী মধ্যযুগের ধর্মীয় ও অলৌকিক পটভূমিকায় সহজেই বর্ণিত হতে দেখা যায়। যদিও শারী-শুয়ার মুক্তিতে রাজা বিক্রমকেশর তাকে বন্দী করতে চাইলে তাদের অনুরোধেই ধনপতি রক্ষা পায়। ধনপতির গৃহে যাত্রা ও পথে দুর্বলার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং খুল্লনাকে তার খবর দেওয়াই বর্তমান অবস্থার পরিপেক্ষিতে বিচক্ষণতার পরিচায়ক। স্বামীর আগমনে খুল্লনার রূপসজ্জা সঙ্গত। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — ‘‘কাব্যের নায়ককে দর্শন করিবার জন্য পুরনারীগণের ব্যাকুল উদ্‌গ্রীবতা এবং সে জন্য বেশভূষার বিপর্যয় — কাব্যের এই অঙ্গ সংস্কৃত হইতে সংক্রামিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বা বৎসরের পর বৎসর কোনো ব্যাপারের অনুসরণ — একটি প্রথা।’’[২২১] মানিক দত্ত এখানে সেই প্রাচীন প্রথাকে অনুসরণ করেছেন। তবে তাদের মিলন বার্তাকে প্রাকৃতিক জগতের মিলন বার্তার সঙ্গে একাত্ম করে কবি রোমান্টিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। কবি লিখেছেন —

> ‘‘সোবন্ন তসর রামা করিল পত্থন।
> তাহাতে আছেন লেখা হংসাহংসীগণ।।
> মউর পেখম ধরে মউরী পিএ ঘাম।
> চোকহা চোকহি তারা বলে রাম২।।’’[২২২]

এই রোমান্টিক আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণে অভিশপ্ত চখা-চখি পাখির রামনামের আধ্যাত্মিক বাতাবরণ মিশ্রিত করে দিয়েছেন। আবার, দীর্ঘদিন বাদে রূপশ্রী খুল্লনাকে দেখে ধনপতির খাওয়ার ইচ্ছা জ্ঞাপন করা রসভঙ্গের পরিচায়ক। উদাসীন বহির্মুখী জীবন ভাবনার পর কবি ধনপতি চরিত্রটিকে একটু গৃহমুখী বাঙালী রূপে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। তাই তাকে খাদ্য রসিক বাঙালী হিসাবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এমনকি ধনপতি বাঙালী ভোজন রসিকের মত খাওয়ার পর নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়ে। এরূপ দুঃখের ঘটনার পর কবি সুযোগ বুঝে হাসির বাতাবরণ কাব্যে সৃষ্টি করেছেন।

সেই সময় ধনপতি খুল্লনাকে আলিঙ্গন দেওয়ার ইচ্ছাকে সামনে রেখে কবি অত্যন্ত কৌশলে ‘খুল্লনার বারমাস্যা’ তুলে ধরেছেন। এভাবে কাহিনীতে এসেছে ‘খুল্লনার বারমাস্যা’। তবে তার বারমাস্যা ফুল্লরার মত সতীন কল্পিত নয়, স্বামীর কাছে ব্যক্ত; তা প্রত্যক্ষ সতীন জ্বালার তপ্ত উত্তাপের স্নিগ্ধ অভিযোগ। খুল্লনা কার্তিক মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত তার ছাগল চরানোর

দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছে ধনপতিকে। প্রশ্ন হচ্ছে, কবি খুল্লনার বারমাস্যাকে কেন কার্তিক মাস থেকে বলতে শুরু করলেন? তার কারণ কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এক হতে পারে, কবি কার্তিক তথা হেমন্ত ঋতুতে প্রাকৃতিক জগতের শূন্যতার সঙ্গে খুল্লনার হৃদয়ের শূন্যতাকে এক করে প্রকাশ করার জন্য; নতুবা তিনি ধনপতির গৌড় থেকে আশ্বিন মাসে ফিরে আসাকে লক্ষ্য করে এরূপ সঙ্গতিপূর্ণ বারমাস্যা বর্ণনা করে থাকবেন।

"আশ্বিনতে গৌড় হৈতে ঘরে আল্যা তুমি।
তোমাকে সকল দুঃখ বলিলাঙ আমি।।"[২২৩]

আশ্বিনের পর বারমাসের ক্রমান্বয় অনুযায়ী খুল্লনা কার্তিক মাসের দুঃখ কষ্ট দিয়ে তার বারমাস্যা বলে থাকবে। বারমাস্যার পর উভয়ের মিলন ঘটে। এইভাবে ধনপতি খণ্ডে এই পর্যন্ত ধনপতি, লহনা ও খুল্লনা ইত্যাদি প্রধান চরিত্র এবং তাদের কেন্দ্র করে ঘটনা আবর্তিত হয়েছে।

অতঃপর কাহিনী ধারায় পূর্ব চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অথচ ভিন্ন জীবনবৃত্তের সূচনা হয়। সেই পরিকল্পনায় কাহিনীর গতি পরিবর্তনে আসে চণ্ডী কর্তৃক মালাধর ছলনার ঘটনাটি। মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত এই ছলনার রীতিটি। মালাধর দুই নারীকে নিয়ে প্রাণত্যাগ করে এবং খুল্লনার উদরে মালাধর, সিংহলরাজ শালবানের গৃহে নিলারাণীর উদরে সুশীলা ও উজানীর রাজা বিক্রমকেশরের গৃহে জয়াবতীর জন্মাবার পরিকল্পনা হয়। চণ্ডীর এই ছলনাকে কেন্দ্র করে ধনপতি খণ্ডে আরও কয়েকটি চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই চরিত্রের বর্ণনার পর দ্রুত কবি কাহিনীক্রম পরিণতির দিকে অভিমুখ ফেরান। স্বভাবতই, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের ঘটনাটি কার্যকারণ সূত্র লঙ্ঘন করে কাহিনীতে এসেছে। ধনপতি কুল পুরোহিতকে জানিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করেছে। তার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলে তার মত বণিকশ্রেণীর; নিম্নশ্রেণীর মানুষ উচ্চশ্রেণীর গৃহে আমন্ত্রণ পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। এই সামাজিক বৈষম্য ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের ঘটনায় লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কবি যেসকল স্থান-নাম ব্যবহার করেছেন তা বাস্তব সম্মত। নিমন্ত্রিত বণিকদের নাম ও তাদের বাসস্থান পরিচয় সেই পরিচয় বহন করে। যেমন — নীলাম্বর, রাম রায়, সনাতন বণিকের বাসস্থান উল্লেখ না থাকলেও সপ্তগ্রাম থেকে বিষ্ণু দত্ত, শঙ্খ দত্ত, অন্যান্য সদাগর এবং চাপালির রাজ্য থেকে আসে চাঁদ সদাগর, ইছানি নগর থেকে লক্ষপতি প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক বণিক আমন্ত্রিত হয়েছিল। তাদেরকে অতিথি বরণের মধ্যে বণিক শ্রেণীর ভাঙনের চিত্র ফুটে উঠে। ধনপতি যদিও প্রথাগতভাবে প্রথমে সমাজপতি হিসাবে চাঁদ সদাগরকে চন্দন ও মাল্য প্রদান করে। কিন্তু সে সময় শঙ্খ দত্ত তা নিয়ে কলহের সূচনা করে। বণিকদের মধ্যে কলহে সেকালের বণিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার ভাঙ্গনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে নীলাম্বর দাসের ঝগড়ায় চাঁদ সদাগর নীলাম্বর দাসকে বলেছে —

"তোর বাপ লবন বেচে চক্ষ করে টেড়া।
ফাএর কারণে লোকসনে করিত ঝগড়া।।
আপন বড়াই প্রথা কর উচ্চারন।
বিনা স্নানে তোর পিতা করিত ভোজন।।"[২২৪]

সামাজিক মান্যতা লঙ্ঘনে বণিকমহলের এই ঝগড়া কাহিনী গ্রন্থনায় তাদের সামাজিক অবনতির দিকটি ফুটে উঠেছে। সামাজিক গঞ্জনা এত ব্যাপকমাত্রায় ছিল যে, তার চেয়ে বিষ ভক্ষণ করে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয় ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় উচ্চবংশজাত কুলবধূ খুল্লনার গৃহসংসার ও সমাজ থেকে বাইরে বনে ছাগল চরানো অপরাধের জন্য। ধনপতি চাঁদ সদাগরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক বলে প্রতিপন্ন করলে অন্যান্য বণিকরা সুযোগ বুঝে খুল্লনার ছাগল চরানোর ঘটনাটিকে নিয়ে তাকে সামাজিক ভাবে হেনস্থা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর কুলরক্ষায় জীবনপণ প্রচেষ্টা ও তার প্রতি স্বামীর সন্দেহ লক্ষ্য করে খুল্লনা সমাজের সামনে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। ধনপতি সাময়িক কলঙ্কের অপবাদ এড়ানো ও স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য জ্ঞাতিদের দেওয়া কলঙ্কমোচনের চিরফাঁদে পা ফেলতে চায়। কিন্তু খুল্লনা সমাজ সচেতন ও বিচক্ষণ বঙ্গনারী। সে জ্ঞাতিদের পরিকল্পনা ও স্বামীর অস্পষ্ট সন্দেহের প্রতিবাদ করেছে। খুল্লনার এই প্রতিবাদ ও সামাজিক বিচক্ষণতাকে তার বিভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলা যেতে পারে। তার এই সতীত্বের পরীক্ষা পুরাণের প্রভাব জাত। রামায়ণে সীতাকে এরূপ সামাজিক কলঙ্ক মোচনের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। বাল্মীকির রামায়ণে সীতা আর্য রমণীর মত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে স্বীয় কলঙ্কের অপবাদ মোচন করেছে। সেখানে বাঙালী বধূর মত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার প্রাক্কালে দেহশুচির বিষয়টি অনুপস্থিত। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণে তা রয়েছে— "শুচি হইয়া সীতা অগ্নি সাক্ষী করে।"[২২৫] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের খুল্লনাও সীতার মত গঙ্গাজলে স্নান করে শুচি হয়ে নেয় এবং নতুন বস্ত্র পরিধান করে চণ্ডী পূজা করে নেয়। সেই প্রসঙ্গে খুল্লনার মুখে শুনতে পাই রামায়ণের রাম কর্তৃক চণ্ডী পূজার অনুরূপ ঘটনা। চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনা একে একে সাজি, সাবল, সর্প, তুলা, ধান্য ও খুর প্রভৃতি ছয়টি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাতেও বণিকদের বিশ্বাস হয় না। সপ্তম পরীক্ষার সময় বিষ্ণু দত্ত খুল্লনাকে অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার কথা বলে। সে উদাহরণ স্বরূপ সমাজের সকলের সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামায়ণের সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা তুলে ধরে। রামকথা লোকসমাজের কাছে একই সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষার উৎস তেমনি হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের সঙ্গেও এর যোগ রয়েছে। রামকথা লোকসমাজকে চলার প্রেরণা এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের নির্দেশ দেয়। বিষ্ণু দত্তের কথায় তার প্রতিভাস রয়েছে —

"বিষ্ণু দত্ত বলে জ্ঞাতি করি নিবেদন।

একচিত্ত হঞা শুন পুন্য রামায়ন।।
দশমাস সীতা ওশক বনে ছিল।
রাবণে মারিঞা রাম সীতা উদ্ধারিল।।
রাম বলে সীতা তুমি শুনহ বচন।
অবশ্য তোমার জাতি নঞাছে রাবণ।।
রাম করি জদি সীতা তোর আছে মতি।
আনল পরীক্ষা দেহ তবে জানি সতী।।
এতেক বচন প্রভু বলে ক্রোধ করি।
জোঘর পরীক্ষা দিল সীতা সুন্দরী।।
ত্রৈলোক্যের নাথ হঞা জেবা কর্ম করে।
সেইসব কথা ভাই কে লঙ্ঘিতে পারে।।"[২২৬]

খুল্লনাকে শেষ পর্যন্ত সতীত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে চিরাচরিত আদর্শ মানতে হয়। কবি সেই ঐতিহ্যবাহী আদর্শকে খুল্লনার সতীত্ব প্রমাণের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন — "খুল্লনার সতীত্বের বিবিধ পরীক্ষার যে বর্ণনা তা পৌরাণিক আদর্শানুগ এবং কাহিনীর মূল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এর মধ্যে বণিক প্রধানদের সভামর্যাদা নিয়ে বিতর্কের অংশই কেবল কৌতুকরস সিঞ্চনে স্বাদু।"[২২৭] খুল্লনা জৌঘর পরীক্ষার পূর্বে ক্রন্দনে ধনপতির 'হরিনাম' করার মধ্যে কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "যে যুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া হরিনাম প্রচার করিয়া মানব মাত্রেরই মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সে যুগ সকল যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[২২৮] স্ত্রীর মরণপণ বিপদে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা অস্বাভাবিক নয়। এরূপ বিপদ শঙ্কুল পরিস্থিতিতে ভক্তকে রক্ষার জন্য শিব ও চণ্ডীর মধ্যে শুরু হয় লড়াই। সেই লড়াই বহুকালের। ভক্তকে নিয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কাহিনীকে সজীবতা দান করেছে। শিব অতীতের চণ্ডী কর্তৃক তার শিষ্যের প্রতি শত্রুতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে। সেই শত্রুতেও রয়েছে রামায়ণের প্রসঙ্গ। খুল্লনাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চণ্ডী শিবস্থানে গেলে সেখান থেকে সে বিমুখ হয়ে ফেরে একমাত্র অতীতের উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সূত্রের কারণে। শেষ পর্যন্ত শিব ও চণ্ডী মিলে ব্রহ্মার কাছে খুল্লনা রক্ষার অনুরোধ জানায়। ব্রহ্মার অলৌকিক মন্ত্রে জৌঘরের অগ্নি শীতল হয়ে যায়। খুল্লনার জৌঘর পরীক্ষার সময় মাঝখানে কবি রাজ্যের রাজাকে কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ ঘটাচ্ছেন। তার কোন নাম নেই; তাই মনে হয় সে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতায় কল্পিত কোন রাজা চরিত্র হয়ে থাকবে। তার মধ্য দিয়ে কবি হয়তো সমকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর গঞ্জনাকে লাঘব এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে শাসকের দ্বারা তর্জন নির্দেশ করেছেন। কবি

হয়ত এরূপ একজন রাজার কল্পনা করেছেন যে কিনা সমস্ত নারী পুরুষের ভেদাভেদ, অত্যাচারকে মোচন করে সমাজে শান্তির বাতাবরণ বয়ে আনবে। তারই আভাস এই কাল্পনিক চরিত্রটির মধ্যে। রাজার কড়া শাসনে জৌঘর পরীক্ষার পর সকল জ্ঞাতিগণ খুল্লনার সতীত্বের কাছে নতজানু হয়ে অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। অন্যদিকে, খুল্লনার কেশ বেয়ে শ্বেত গঙ্গাজল পড়াও পবিত্রতার পরিচায়ক। তাই তার মত সতীর হাতে রান্না খেয়ে তাদের পুণ্যবাণ হওয়ার ইচ্ছা অস্বাভাবিক নয়।

"বিষ্ণু দত্ত বোলে মা চরণে দেহ স্থান।
তব হস্তের অন্ন খাব হব পুন্যবান।।"[২২৯]

খুল্লনার অলৌকিক মহিমা তথা দেবীর শক্তির প্রকাশ করাই কবির মূল উদ্দেশ্য। দেবী চণ্ডীর মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে খুল্লনাকে তিনি উপযুক্ত বাঙালী গৃহবধূ করে তুলতে পারেন নি। খুল্লনার কাছে সমস্ত জ্ঞাতিরা রান্না খেতে চাইলে তার রান্নায় অনভিজ্ঞতার পরিচয় ও দেবীর সহায়তা প্রার্থনা তার প্রমাণ। সে দেবী চণ্ডীকে বলে —

"কেমতে রন্ধন করি তাহা নাই জানি।
পার্ব্বতী বলেন বাছা না ভাবিহ তুমি।।"[২৩০]

তাই মনে হয়, চণ্ডীর অলৌকিক মহিমা দ্বারা খুল্লনাকে সতী প্রমাণ করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তার সতীত্ব কিংবা অলৌকিকতাকে ধনপতি বা লহনা স্বীকার করল কিনা তার পরিচয় কাব্যের কোথাও বর্ণিত হয় নি। প্রসঙ্গত, কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে— "খুল্লনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন — তাহাতে খুল্লনাকে দেশের লোকের দেবী মনে করিয়া পূজা করিবার এবং ধনপতিরও চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও খুল্লনার দৈবী শক্তি স্বীকার করা, খুল্লনারও লহনার দাসীত্ব স্বীকার করার কথা নয়। কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনে কবি সে দিকটা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের গতানুগতিক প্রথা অনুসারে কতকগুলি অসম্ভব ব্যাপারের আরোপে সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়াই কবির দায়িত্ব শেষ হইয়াছে — তাহার ফলাফলের জের টানিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইহাই ছিল সে যুগের কাব্যের ধারা।"[২৩১] কবি মানিক দত্তের কাব্যেও সেই ধারাটি অনুসৃত হয়েছে।

খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার পর ধনপতি উজানীর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। সেখান থেকে ধনপতি খণ্ডের দ্বিতীয় অংশের সূচনা। কাহিনী পুনরায় মোড় নেয়। কাহিনী পারিবারিক বৃত্ত ছাড়িয়ে সদাগরী জলযাত্রার আখ্যানে প্রবেশ করেছে। ধনপতিকে এবার চন্দন আনতে সিংহলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কাহিনীতে ধনপতির সিংহল যাত্রা দেবী চণ্ডীর পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। ছোট একটি চুরির ঘটনা দ্বারা কবি কাহিনীর গতিবেগকে পরিবর্তন করলেন সুন্দর ভাবে। চণ্ডী রাজার ঘরে নেপাল নামক চোরকে দিয়ে চন্দন চুরি করতে বলে এবং রাজাকে বিষবাণ মারে।

রাজাকে বাঁচানোর জন্য সেই অবস্থায় চন্দন প্রয়োজন, তাই ধনপতির সিংহল যাত্রা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সিংহল নগর আগর চন্দন, শঙ্খ ও চামড়া প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সিংহলে ধনপতির যাত্রাকে কেন্দ্র করে সমাজে নারীর অবস্থার বিষয়টি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। ধনপতির সঙ্গে খুল্লনাও সিংহলে যেতে চাইলে ধনপতির কথায় সমাজবস্থার স্বরূপটি চিহ্নিত হয়েছে। সমাজে নারীর অবস্থার সঙ্গে শাসকশ্রেণীর জৈবিক দুর্বলতা এবং সমাজে অপশাসনের পরিচয়ও সঙ্গত কারণে উঠে এসেছে। তাই খুল্লনাকে দারুণ সতীনের হাত থেকে এবার রক্ষার জন্য ধনপতি পাড়ার লোকজনকে ডেকে লহনাকে সামনে সাক্ষী করে নিয়েছে। ধনপতির যাত্রাকালে শিব স্মরণের বিষয়টি বণিক শ্রেণীর শৈবধর্মের প্রতি আস্থা প্রকাশ পায়। সে ভ্রমরা ঘাটে শিব পূজার জন্য যাত্রা করলে খুল্লনার স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় চণ্ডী পূজার বিষয়টি কাহিনীতে আসে। একই পরিবারে দুই বিপরীত দেবতার পূজা কাহিনী গ্রন্থনায় পরক্ষ ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে। খুল্লনার চণ্ডী পূজার প্রারম্ভিক সূচির মধ্যে তান্ত্রিক ধর্মের সাধনার প্রকাশ রয়েছে। খুল্লনার স্নান করার সময় পূর্বদিক হয়ে সূর্য প্রণাম তার প্রমাণ দেয়।

> ''স্নান তর্পন করি আপনার সুখে।
> সূজ্যের নামে য়র্ঘ্য ধরিল পূর্ব্বমুখে।।''[২৩২]

আত্মসুদ্ধির পর খুল্লনা দেবীকে স্মরণ করে। তার স্মরণে দেবীর মুখের তাম্বুল খসে পড়া, বাম অঙ্গ, দক্ষিণ চোখ কাঁপা, কালো পেঁচা ডাকা প্রভৃতি লৌকিক বিশ্বাসের পরিচায়ক। এই ধরনের কুসংস্কার দেবী চণ্ডীর চরিত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডী চরিত্রে লৌকিকরূপই এখানে বিধৃত রয়েছে। এই অবস্থায় প্রকৃত অমঙ্গল জানতে পদ্মার জ্যোতিষ আনয়ণ ও গণনার মধ্যেও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার লুকিয়ে আছে। সে যাইহোক, পুথি গণনা করে চণ্ডী খুল্লনার কথা জানতে পারলে দেবী তার সামনে সিংহবাহনে পঞ্চদাসী সহ মানুষ রূপে আবির্ভূত হয়। এখানে দেবীর অলৌকিক মহিমার তুলনায় অভিজাত পরিবারের মানবিক রূপটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। কবি বলেছেন —

> ''সিংহপৃষ্ঠে নারায়নী চড়িলা তখন।
> পঞ্চ দাসী সঙ্গে করি উজানী গমন।।
> সিংহ পীষ্ঠ ছাড়ি মাতা ঘটেত বসিল।
> মানুষের রূপে মাতা খুলুনাক ডাকিল।।''[২৩৩]

গৃহের ভিতরে মনুষ্যরূপী দেবীর সঙ্গে খুল্লনার কথাবার্তা ও তাতে লহনার সন্দেহ এবং ধনপতির কাছে তার সেই বার্তা প্রেরণ কাহিনীতে স্বাভাবিক ও সত্য বলে মনে হয়। লহনার বার্তায় ধনপতির গৃহে ফিরে যাওয়ায় কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই দ্বন্দ্ব শিব শিষ্য ধনপতির সঙ্গে শক্তিদেবী

চণ্ডীর। তাই ধনপতির যাত্রাকালেই অমঙ্গল সংকেত রয়েছে। সে যাত্রার প্রাক্‌কালে ঠুটা বানর, আকাশে অমঙ্গল ধ্বনি, সম্মুখে গৃধিনী, বামে সাপ ও ডাইনে বানর দেখে। গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেছেন — ''লোকের কুসংস্কার খুব ছিল। পথে গোসাপ, কচ্ছপ, শজারু, শশক দেখিলে যাত্রাভঙ্গ হইত। মাথার উপরে ডোমচিল ফিরিলে বা শুক্‌না ডালে কাক ডাকিলে, পথে কাঠের বোঝা দেখিলে, পায়ে হুচোট্ লাগিলে, বামে সাপ ও দক্ষিণে শিয়াল দেখিলে, মাকুন্দ চোপা পথে দেখিলে লোকে অমঙ্গল আশঙ্কা করিত। পথে তেলীকে তৈলভাণ্ডসহ দেখিলে লোকের মন উদ্বিগ্ন হইত।''[২৩৪] সমকালীন বাস্তব লোকসংস্কারকে কবি ধনপতির চরিত্রে সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষের মত ধনপতির মনও উদ্বিগ্ন হয়। তবে কাহিনী গ্রন্থনায় ধনপতির উদ্বিগ্নতার আগে খুল্লনার পুনরায় দেবী চণ্ডী পূজার ঘটনাটি সংযোজিত হয়। সেই পূজা তন্ত্রশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। তন্ত্র শাস্ত্রের পূজার বীজমন্ত্র উচ্চারণ, ঘটপূজা, আত্মবলি দান ও ভক্তের শোণিত দানে দেবী অধিক তুষ্ট হয়। 'সপ্তশতী সমন্বিত চণ্ডী চিন্তা' গ্রন্থের সম্পাদক মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছেন — ''তন্ত্রশাস্ত্রকার বলেন — নিজ দেহ হইতে রুধির দিলে দেবী সহস্রগুণ তুষ্ট হন। ''সহস্রং তর্পিতা দেবী স্বদেহ-রুধিরেণবৈ।'' সকল বলির শ্রেষ্ঠ বলি নিজ অহংকার-বলি। স্বদেহ-শোণিত-দান আত্মবলিদানের একটি প্রকৃষ্ট প্রতীক। অহংকার সমর্পণের ওটি স্থূলরূপ।''[২৩৫] খুল্লনার দ্বিতীয় বার চণ্ডী পূজায় তন্ত্রের পূজা পদ্ধতির পরিচয় রয়েছে।

''বীজমন্ত্র জপিয়া ঘটেতে দিল জল।
একমনে পূজে রামা সর্ব্বয়ে মঙ্গল।।
খুলুনা দেখিল দুর্গা না হৈল সদয়ে।
অবশ্য স্বামীর দেখি জীবন সংশয়ে।।
মস্তকের চুল দিয়া চামর ডুলায়ে।
পিঠের চামড়া কাটি চান্দোআ টাঙ্গায়।।
দশ আউল কাটি পাষান সাজায়।
জিভা কাটিয়া রামা সলিতা পাকায়।।
দুই কর্ন্ন কাটি রামা সাজায়ে খাবর।
কাটিল সকল মাংস রক্ত পরে ধার।।
ঘৃতে মাখিয়া দিল ঘটের উপরে।
এতেক করিল রামা স্বামীর কারণে।।
*　　　*　　　*
গলে কাটারি দিতে চাহে মঙ্গলচণ্ডীগণ।

হস্ত ধরি রাখিল মঙ্গলচণ্ডীগণ।।"[২৩৬]

তাতে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব এবং খুল্লনাকে ধনপতি যাত্রার পথে বিপদ ও বারোবছর কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কারাগারাবদ্ধ থাকার কথা বলে। কাহিনী ধারায় এই বর্ণনা পাঠক-শ্রোতার কাছে পরবর্তী ঘটনার উদ্দীপক সংক্ষিপ্তাভাস। কাহিনীর প্রয়োজনে চণ্ডীর মুখে স্বামীর যাত্রাপথে দুর্ভোগের কথা শুনেও ধনপতিকে জানায় নি বা সচেতন করে নি। খুল্লনা ধনপতিকে জানালে হয়তো কাহিনী ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত ধারা মেনেই কবি এখানে কাহিনীতে বণিক সম্প্রদায়ের সদাগরী বাণিজ্যের ঘটনা অনুপ্রবেশ ঘটান। কাহিনীতে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাত্রাকালীন সংকট বা আশঙ্কার আভাস রয়েছে। ধনপতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাত্রাকালে নানা অশুভ সংকেত লক্ষ্য করে সে শঙ্কিত হয় এবং পুথি গণনা করে পূর্বেই বিপদ ও বিপদ মুক্তির কথা জানতে পারে। একথা জানা সত্ত্বেও ধনপতি তার যাত্রা পরিবর্তন করে না। কাহিনীর দিক দিয়ে ধনপতির এই যাত্রার অপরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। এবং পূর্বেই ধনপতির পুত্র সম্পর্কে জানা এবং সেক্ষেত্রে অপুত্রক পিতার কোন স্নেহঘন পিছুটান কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। যেন কাহিনী চরিত্রকে জলপথে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ ধনপতি জানে যে, তার অনুপস্থিতিতে খুল্লনা লহনার দ্বারা পুনরায় অত্যাচারিত হতে পারে। তবু কেন ধনপতি আবার সিংহলে যাত্রা করল? কাহিনীতে ধনপতির যাত্রাই গ্রন্থনার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা। একদিকে, সপত্নী পীড়নের ক্রিয়াকৌশলের অভিনবত্ব কাহিনীতে রস সঞ্চার করবে। অন্যদিকে, ধনপতির সঙ্গে দেবী চণ্ডীর বিরোধ নতুন মাত্রা লাভ করবে।

ধনপতি তার জীবন সংকট দেখে খুল্লনার উদ্দেশ্যে পত্র লিখে। সেই পত্রের প্রমাণ স্বরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র আসে। কাহিনী গ্রন্থনায় এই 'জয়পত্র' নতুন আঙ্গিকের পরিচয় প্রদান করে। ধনপতির এই চিঠিতে যেমন সমাজ সচেতনতার দিকটি রয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক পরিচয়জ্ঞাপক রাজবংশ ও বণিক বংশের তথ্য রয়েছে। কবি ধনপতির চিঠিতে বলেছেন —

"জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি।
জয়পত্র লেখে সাধু হেট করি মতি।।
হস্তে কলম করি লেখে সদাগর।
বুক বাহি পড়ে তার নঞানের জল।।
*　　　　*　　　　*
ধন্য রাজ্য বটে নগর উজানী।
সেই দেশে রাজা বৈসে চন্দ্রচূড়ামনি।।
চন্দ্রচূড়ামনি রাজা কেশোবার নাতি।

সেই রাজ্যে বৈসে বাণিয়া ভূয়াপতি।।
ভূয়াপতির পুত্রের নাম বাণিয়া গজমতি।
তাহার পুত্র বাণিয়া রসপতি।।
রসপতির পুত্রের নাম বাণিএগ্রা রঘুপতি।
তাহার পুত্রের নাম বাণিএগ্রা জয়েপতি।।
জয়েপতির পুত্রের নাম বাণিএগ্রা ধনপতি।
জে কালে খুলুনার হইল গর্ভ পঞ্চমাস।
তখনে গেইলাম আমি সিংহলে পরবাস।।"[২৩৭]

উজানী নগরের বর্তমান রাজা বিক্রমকেশর। তার পিতা হল চন্দ্রচূড়ামণি। চন্দ্রচূড়ামণি রাজার পিতামহ ছিল কেশোবার। সেই রাজার আমলে বণিক ভূয়াপতি; ভূয়াপতির পুত্র গজমতি; গজমতির পুত্র রসপতি; তার পুত্রের নাম রঘুপতি; রঘুপতির পুত্র জয়েপতি; জয়েপতির পুত্র হল ধনপতি। এই ধনপতি সকল বণিক সমাজকে সাক্ষী করে যাচ্ছে সিংহলে। সে পত্রে বলে দিচ্ছে খুল্লনার পুত্র বা কন্যার নাম ও তার পড়াশুনা শেখানোর কথা। সেই সঙ্গে পিতাকে উদ্ধারে পুত্রের সিংহলে যাত্রা। কাহিনীতে এইরূপ পূর্বাভাস পাঠক সমাজকে অত্যন্ত কৌতূহলী ও আগ্রহী করে। কবি তার সঙ্গে কুলীন সমাজের বিবাহ সম্পর্কে বাস্তব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। ধনপতি পত্রে বলে—

"কুলীন ঔরস দেখি কন্যা বিভা দিবে।
জে কিছু কহিলাম আমি অন্যথা না হবে।।
জামাতা রহিবে জদি কুলের ভাজন।
শশুরের উদ্দিশে যাবে দক্ষিন পাটন।।
পুত্র পড়িয়া জদি ঘরে অন্ন খাএ।
বাপ তার গাধা শুকুনী তার মাএ।।"[২৩৮]

এখানে ধনপতি চরিত্রে স্বল্প পরিসরেই পিতার দায়িত্ববোধ ও স্বাবলম্বী পুত্রের আশা ইত্যাদিতে সার্থক পিতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এখানেই তার পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্যবোধ সমাপ্ত হয়।

ধনপতির যাত্রাপথে নদী উপকূল অঞ্চলের যেসকল স্থানের নাম করা হয়েছে তা অধিকাংশই কবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। কবির জন্মভূমি মালদহ জেলার অন্তর্গত স্থান কাব্যে উঠে এসেছে। যেমন — আমুয়ার মুলুক, বোগাই চণ্ডী, কোদালিয়ার ঘাট, ঠিকিলাগোলা, নদীয়া শান্তিপুর, ভীমঘাট, কুমারপুর, ইত্যাদি। এই কুমারপুর যাওয়ার পর আসে মগরা। ধনপতি মগরায় আসার পরই দেবী চণ্ডী তাকে হেনস্থা করার জন্য ইন্দ্রের কাছ থেকে বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির আনয়ণ করে। এখানে চণ্ডী হনুমানকে দিয়ে ধনপতির ছয় ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেওয়া চরিত্রানুগ

হয়েছে। কাহিনীতে চণ্ডী কর্তৃক ধনপতির ক্ষতি করার জন্য উপযুক্ত মগরার খালকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই মগরা খাল সম্পর্কে গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন — ‘‘ছত্রভোগ, ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের অন্তর্গত। ... এখন ছত্রভোগের নিকট গঙ্গার খাতের কেবল চিহ্নমাত্র আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা বহু গ্রন্থে মগরার খালের নাম পাওয়া যায়। মগরার জলাবর্ত্তে পড়িয়া অনেক সদাগরের বাণিজ্যতরি ডুবিয়া গিয়াছিল।’’[২৩৯] মগরার পর ধনপতি কালীদহে পৌঁছায়। কালীদহে দেবী চণ্ডীর স্বতন্ত্র এক রূপের প্রকাশ। সে গজ লক্ষ্মীর মূর্তি। কমল বা পদ্মের সঙ্গে তার যোগসূত্র এবং বাম হাতে একটি হাতি গলার্ধকরণ করছে ও ডান হাতে আবার তাকে উগরাচ্ছে। সে চণ্ডীর মত ছদ্মবেশী বৃদ্ধা রমণী নয়; সে কুমারী রূপবতী ও মোহিনী। কবি সেই কমলে-কামিনী রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে —

‘‘মান সরবর হৈতে আনিল কমল।
কালিদহে নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল।।
কমলের ডাণ্ডি হৈল জগতের মাতা।
মায়ারূপে হইলেন কমলের পাতা।।
জলখাত্যে আল্য ইন্দ্রের গজরায়।
বামহস্তে ধরি মাতা তাহাকে ফিরাএ।।
বামহস্তে গজ লএঞা দক্ষিনে গরাসে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সাধুর তরাসে।।
সাধু বলে শুন ভাই জতেক গাবর।
কন্যাকে ধরিএঞা তোল নোকার উপর।।
অপূর্ব্ব দেখিএ এই কন্যা রূপবতী।
তিলোত্তমা হএ কিবা ইন্দ্রের যুবতী।।’’[২৪০]

এই গজ-লক্ষ্মীর রূপ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাব্যময় হয়ে উঠেছে। সুকুমার সেন মনে করেন — “The story seems to be a bare fragment of an old story, and the goddess too is old, although it is not recorded in any lord Purana. The goddess (now known in Bengal as *Kamale Kamini* (‘Lady-on-the lotus’) presents an unknown aspect of the great goddess, the dark side of Gaja-Laksmi. In plastic art however the goddess on her lotus seat and attended by elephants is recorded as early as second century B.C. (Sanchi).”[২৪১] সুকুমার সেন মহাশয় এই কমলে কামিনীর সঙ্গে জার্মান লেখক তাকিতূস্ (Tacitus) -এর গেরমানিয়া (Germanis) গ্রন্থের কাহিনীর মিল

লক্ষ্য করে বলেছেন — "The goddess as described Tacitus has distinct affinities with Mukunda's *Kamale Kamini* as well as with Manasa as narrated in Middle Bengali Poetry. In sculpture Manasa often appears riding on an elephant. In her annual worship which is still held in pomp in some areas in the district of Burdwan, the deity is carried in procession through the village. The island of Nerthus and *Kamale Kamini* (or Gajalaksmi) Corresponds to the iron citadel (ayasi pur) of river goddess Sarasvati..."[২৪২] রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন — ''গজলক্ষ্মীর পূজাও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে গজলক্ষ্মী ও মঙ্গলচণ্ডী মিশিয়া কমলে-কামিনী রূপধারণ করিয়াছেন।''[২৪৩] এই কমলে-কামিনী রূপ দর্শনের পর ধনপতি সিংহল রাজা শালবানের রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার নদী পথ থেকে সিংহলের রাজদরবারে প্রবেশের পূর্বে তেলী, মালী ও বিপ্র পাড়া অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সমাজে রাজ-রাজাদের নগর থেকে দূরে নিম্নশ্রেণীর বৃত্তিজীবী মানুষদের বসবাস ছিল, সেই সামাজিক অবস্থানের সূত্র কবি স্পষ্ট করে তুলেছেন। পাশাপাশি, ধনপতি রাজা শালবানকে কমলে-কামিনীর রূপ দর্শনের বিফল হলে প্রতিজ্ঞানুযায়ী সে কারারুদ্ধ হয়। তার আক্ষেপে চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেম নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনপতি বলে —

''জোগী বা সন্ন্যাসী হৈব প্রেমের কেথা গলে দিব
মাগি খাইতে জাব উজয়ানি।।''[২৪৪]

বন্দী ধনপতিকে দেবী চণ্ডী প্রাণে মারতে পারে নি। কারণ ধনপতি খণ্ডের উদ্দেশ্য বিবাহিত কুলবধূদের দ্বারা দেবীর ব্রত প্রচার করা। ধনপতিকে প্রাণে মারলে তার স্ত্রী খুল্লনা দেবী চণ্ডীর বিপরীত হবে।

''পদ্মা বোলে শুন মাতা আদ্যা ভবানী।
সাধু মৈলে বাড়ি হবে সুন্দর খুলুনি।।''[২৪৫]

তাই ধনপতি চরিত্রটি কাহিনীর বেঁচে থাকে। কিন্তু তার অবস্থান হয় কারাগারে। তাকে উদ্ধারের জন্য কাহিনীতে শ্রীমন্তের জন্ম বিষয়টি গুরুত্ব পায়। সেই কারণেই কাহিনীও সিংহল থেকে উজানীর অভিমুখে গতিমুখ ফেরায়।

দেবী চণ্ডী শ্বেতকাক হয়ে উজানী নগরে আসে। সে স্বপ্নে খুল্লনাকে ধনপতির বন্দীদশার কথা জানায়। তাতে খুল্লনার আচরণ গ্রাম্য মহিলার মত বলে মনে হয়। সে স্বামীর কষ্টে গরল ভক্ষণ করে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর বৈধব্য জীবন যাত্রার বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য কাহিনীতে দেবীর অলৌকিক মায়ায় 'তিয়র' বা মৎস্যজীবী সৃজন। তারা উজানীতে এসে

খুল্লনাকে ধনপতির মৃত্যুর বার্তা দেয়। তাতে খুল্লনা তার দু'হাতের শাখা ভাঙ্গলে চণ্ডী প্রকৃত সত্য কথা বলে। সেই প্রসঙ্গে উঠে আসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জীবন সত্যের ঐতিহ্যবাহী নীতি কথা। সেখানে কবির কল্পনা শক্তি ও উপমা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির কথায় —

"দুই হাতের শঙ্খ রামা পাথরে আছারে।
ডাকিয়া বোলেন দুর্গা স্বামী আছে তোরে।।
পুরুষ বিনা নারীর যৌবন মরা।
চন্দ্রবিনা উজ্জ্বল করিতে নারে তারা।।"[২৪৬]

কাহিনীতে আসে খুল্লনার সাধভক্ষণ বিষয়টি। সাধভক্ষণের জন্য দুর্বলা হাটে যাত্রা কথা পূর্বে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায় না। দুর্বলা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত, তেলি ও গোয়ালা নারীর বাড়ি থেকে বিভিন্ন প্রকার শাক সংগ্রহ করে। তার একটি তালিকা কবি কাহিনীতে যুক্ত করেছেন। মূলকাহিনীর সঙ্গে এর সম্বন্ধ অটুট নয়। এখানে গ্রাম বাংলায় পরিচিত শাকের একটি তালিকা পাওয়া যায়। যেমন — পালং, গীমা, হেলেঞ্চা, তিতো করলা, শীতল গীমা, পুঁই, গন্ধারি, খুরিয়া বা খুদিয়া, তেলা কুটি, কলম্বু, ভাঙ্গের ডগা, বথুয়া প্রভৃতি। এই বর্ণনার পরেই খুল্লনার সাধভক্ষণ। সাধভক্ষণের জন্য আনুষঙ্গিক রীতি-নীতির পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা কবি দেন নি। সাধভক্ষণের বর্ণনা এখানে অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। কাহিনীতে এর নামমাত্র অবস্থান; গ্রন্থনা এখানে সজীবতা পায় নি বলে মনে হয়।

বলাবাহুল্য, এরপর কাহিনীর মোড় ফেরে। শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করে কাহিনী নতুন পথে যাত্রা করে। তার জন্মের আগে খুল্লনার প্রসব যন্ত্রণার উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং সাধারণ রীতি অনুযায়ী শ্রীমন্তের জন্ম হয়। জন্মের পর হিন্দুধর্মের যেসকল আট প্রকার রীতি-নীতি পালন করা হয় তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তীর্থের জলে স্নান, তিন দিনে ধূল বাড়ানো, পাঁচ দিনে পাঁচুটি, ছয় দিনে আইহ দ্বারা ষষ্ঠী পূজা, একমাসে নামকরণ, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন, পাঁচ বছরে কর্ণভেদ ইত্যাদি। বণিক পরিবারের ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

শ্রীমন্তের বাল্য ক্রিয়া বিষয়টি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে এবং তা পুরাণ প্রভাবিত নয়; গ্রাম্যবালকদের খেলার প্রত্যক্ষ চিত্র কবি এখানে অঙ্কন করেছেন। তা একান্তই লৌকিক বলে মনে হয়। শ্রীমন্তের বাল্যকালে দৌরাত্ম লক্ষ্য করে মাতা খুল্লনা তাকে গুরু গৃহে শিক্ষার জন্য নিয়োজিত করে। লক্ষণীয়, এখানে পূর্ব উল্লেখিত শ্রীমন্তের শিক্ষক ধনাই পণ্ডিতের নাম নেই। এখানে তার নাম শ্রীহরি। তার কাছে শ্রীমন্ত বাল্য বয়সে শিক্ষা লাভ করেছে। তার বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ও ক্রমানুক্রমিক শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায়।

"দুবলা ডাকিয়া আনে পণ্ডিত শ্রীহরি।

শুভক্ষণ গণিঞা ছাল্যাকে দিল খড়ি।।
ক খ পড়েন সাধু গুরুর মন্দিরে।
বার ফলা পড়ি সাধু শাস্ত্রপাট করে।।
পিঙ্গল পড়িল আর পড়িল সুবন্ত।
অভিধান পড়িয়া শব্দের অন্ত।।
দিবসে পড়েন সাধু গুরুপাট স্থানে।
রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিঞা আপনে।।”[২৪৭]

সমকালীন উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা একদিকে যেমন গুরুগৃহে শিক্ষালাভের জন্য যেত, তেমনি শিক্ষার উন্নতির জন্য গৃহশিক্ষক (Private Tutor) নিয়োজিত করা হত। লক্ষণীয়, অপার্থিব জগতের দেবীকে পার্থিব জগতের গৃহশিক্ষিকা রূপে অঙ্কন করা এবং নারীর গৃহশিক্ষকতা করা সকালীন সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত বিরল ও নজিরবাহী দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়।

শিক্ষাগুরুর সঙ্গে শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব কাহিনীর গ্রন্থনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। শ্রীমন্তের গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ ও গুরুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব — এই দুটি ঘটনা অলৌকিকতা দিয়ে সংযোগ সূত্র রচনা করা হয়েছে। শ্রীমন্তের হাতে খড়িতে দেবী চণ্ডী ভর দেওয়ায় তা মাটিতে পড়ে যায় এবং শ্রীমন্ত গুরুকে তা তুলতে আজ্ঞা করায় এই দ্বন্দ্বের কারণ। তাই গুরু অপমানিত হয়ে তাকে ‘জারজ’ সন্তান বলে গালাগাল দেয়। একথা শ্রবণের পর শ্রীমন্ত চরিত্রে অভিমান, সংবেদনশীলতা ও হৃদয়দংশন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে সকলের অজান্তে লজ্জায় ঘৃণায় গৃহের দরজা বন্ধ করে। সে জানে এই অবস্থায় সমাজের কাছে তাকে তাচ্ছিল্য, উপহাস ও গঞ্জনার পাত্র হতে হবে। সমাজে পিতৃ-পরিচয়হীন জীবনের তুলনায় মৃত্যু তার কাছে শ্রেয়। এদিকে খুল্লনা পুত্র সঠিক সময়ে না ফেরায় তার মধ্যে বাৎসল্য বোধের উৎসার ঘটে। তার এই সন্তান অদর্শনের ব্যাকুলতা ও স্নেহরস সঞ্চার যশোদার বালক কৃষ্ণ অদর্শনের অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। মাতার কাছে সন্তানের পিতৃ পরিচয় উদঘাটন নিয়ে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন বিবৃত হয়েছে তা কবির বর্ণনায় অত্যন্ত নাটকীয় ও জীবন্ত রূপ পেয়েছে। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে —

“মাতাকে বলেন সাধু ঘরে থাকিঞা।
আমার লাগিয়া কেন ফিরিছ কান্দিঞা।।
কপাট ধরিঞা কথা বলেন শ্রীপতি।
মাতা আছ বিদ্যমান পিতা গেল কতি।।
শ্রীমন্ত বলেন মাতা না কর ক্রন্দন।
পণ্ডিতে বলিল মোকে জারুয়া বচন।।

কি হইল মোর পিতা দেহত কহিঞা।
নহিলে মরিব আমি গরল ভক্ষিয়া।।"[২৪৮]

কবির এই বর্ণনা অত্যন্ত সমাজ-বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলে মনে হয়। কবি এখানে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই হয়তো তাঁর বর্ণনা এত সুচারু ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

শ্রীমন্তের আত্মশ্লাঘার পর কাহিনী গ্রন্থনায় অনিবার্য ফলস্বরূপ পরিচয় উদ্‌ঘাটন বিষয়টি এসে যায়। তাই খুল্লনা কর্তৃক ধনপতির চিঠি দান, পিতার উদ্দেশ্যে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার প্রস্তুতি বর্ণিত হয়েছে। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "শ্রীমন্তের কাহিনীর প্রধানতঃ দুইটি ভাগ। একটি ভাগ বাস্তবরাজ্য — আর একটি ভাগ স্বপ্নরাজ্য। শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা হইতে স্বপ্ন জগতের সূত্রপাত।"[২৪৯] শ্রীমন্তের সিংহলে যাত্রার জন্য খুল্লনা সপ্তডিঙ্গা তৈরী করতে দেবী চণ্ডীকে অনুরোধ জানায়। খুল্লনা কর্তৃক দেবী চণ্ডী পূজায় তন্ত্রের সাধনার পূজা পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ভূত সুদ্ধি, নানা জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী উপাচার, আদ্য মন্ত্র স্মরণ, শত শত ছাগল-মহিষ-ভেড়া বলি, ব্রাহ্মণের মন্ত্র পাঠ, খুল্লনার নিজ বুকের রক্ত প্রদান করা হয়েছে। খুল্লনার পূজায় দেবী চণ্ডী এবং তার সঙ্গে বিশ্বকর্মা হনুমান বা মারতীর আগমন হয়। খুল্লনা দেবীকে সপ্তডিঙ্গা নির্মাণ করতে বলে। ডিঙ্গা তৈরীর জন্য কাহিনীতে বিশ্বকর্মা, হনুমান বা মারতীর মত শক্তিধর পুরাণের চরিত্রের আনয়ন ঘটেছে। কার্যক্ষেত্রে তাদেরকে সাধারণ বৃত্তিজীবী সূত্রধর সম্প্রদায়ে পরিণত করা হয়েছে। এখানে দেবতা চরিত্র কাহিনীতে মানব রস সঞ্চার করেছে। এই দেবতার মানবায়নের ক্ষেত্রে দেবী চণ্ডীর মায়া শক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, শ্রীমন্তের সূত্রধরদের জাতি জিজ্ঞাসা করার মধ্যে হিন্দু সমাজের জাত পাতের দিকটি ফুটে ওঠে। তবে এই তিনজনের ডিঙ্গা তৈরীর বিস্তৃত বর্ণনা কবি দিয়েছেন। তারা ক্রমান্বয়ে মধুকর, জাত্রামঙ্গল, সাধু, মধু, রত্ন, চন্দনের পাট প্রভৃতি নামে ডিঙ্গা তৈরী করে। কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে এই ডিঙ্গা তৈরীর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য। ডিঙ্গার নামের বৈচিত্র্যের চমক সত্যি আকর্ষণীয়। এমনকি শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার সময় উজানীর উদ্‌বৃত্ত বাণিজ্য সামগ্রীর যে তালিকা পাওয়া যায় তা কাহিনীতে প্রাসঙ্গিক-দ্রব্যবস্তু বলে মনে হয়। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "কবি বাণিজ্যের যে পণ্য বিনিময়ের তালিকা দিয়াছেন — তাহাতেও যথাযথতা রক্ষা করা হয় নাই। ... এ তালিকা একটা আলঙ্কারিকতার (Rhetorical Display) দৃষ্টান্ত মাত্র।"[২৫০] শ্রীমন্ত বাণিজ্যের জন্য নারিকেল, হলুদ, শুকুতা, আদার সুট, পিপলী, বুট, তেজপাতা, জিরা, লংকা, শ্বেত চামড়া ইত্যাদি দ্রব্য নিল। এই সকল বাণিজ্যের সামগ্রী নিয়ে যাত্রার সময় শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীকে প্রণাম ও ব্রাহ্মণের কাছে আশির্বাদ নেয়। কারণ ব্রাহ্মণের স্থান সমাজে সকলের উঁচুতে। শ্রীমন্তের এই আচরণের মধ্যে প্রকৃত হিন্দু রূপের প্রকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রখ্যাত সমালোচক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা স্মরণে

আসে। তিনি বলেছিলেন — ‘‘যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম উপদেশ পাওয়া যায় না, তাঁহারাই হিন্দু। হিন্দুরা জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ জাতিতে পাওয়া যায় না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে সকলের উঁচু।’’[২৫১] কবি বলেছেন —

‘‘জাত্রা সমএ তথা ব্রাহ্মণ আইল।
মস্তক ধরিঞা দ্বিজে আশীর্ব্বাদ দিল।।’’[২৫২]

যাত্রাকালে খুল্লনার ক্রন্দন এবং বিপদ থেকে উত্তরণের বার্তা কাহিনী ধারার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার বিপদ-মুক্তির অভয়-নিদান সংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়। সেই প্রসঙ্গে কাহিনীতে ‘ব্যাধ খণ্ড’-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। খুল্লনা শ্রীমন্তকে বলেছে —

‘‘দুর্গা পূজা করি বাছা পাঞাছিলাঙ তোক।
নিদান পড়িলে বাছা স্মরিবে চণ্ডীক।।
সুরথ নামেত ছিল কলিঙ্গের রাজা।
নানা উপহারে সেহ চণ্ডীর করে পূজা।।
কালকেতু নামে এক ব্যাধের নন্দন।
একচিত্ত হঞা সেই করিত সেবন।।
চণ্ডীর সেবনে বীর দৃঢ় কল্য মন।
প্রসন্ন হইঞা তাকে চণ্ডী দিল ধন।।
ধন পাঞা মহাবীর করিলেক পূজা।
চণ্ডীর কৃপাতে সেই গুজরাটের রাজা।।’’[২৫৩]

সেই পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে অভয়দাত্রী, অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তিশালিনী দেবী চণ্ডীর স্বরূপকেই স্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে। মধ্যযুগের ধর্মভাবনার বাতানুকূলে কবির এই ধরনের বর্ণনা হয়তো স্বাভাবিক।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডের কাহিনী গ্রন্থনায় সমাজ সচেতনতা সমকালীন পরিবেশে সামঞ্জস্য বলে মনে হয়। কুলবধূর আত্মসম্মান বিনষ্টি হিন্দু সমাজের কাছে ভয়াবহ যন্ত্রণার ছিল। সামান্য চারিত্রিক দোষে সমাজ তাকে ত্রাসে, গঞ্জনায় বিদ্ধ করত। স্বল্প বয়সে শ্রীমন্ত সমাজের এই স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তার বাল্য বয়সের জীবনাভিজ্ঞতা তার প্রমাণ দেয়। কবি শ্রীমন্ত চরিত্রটিকে সমাজের মুখপত্র রূপে অঙ্কন করেছেন। তাই খুল্লনার জয়পত্র নিয়ে শ্রীমন্ত সিংহলে যাত্রার সময় মাকে সে কথা স্মরণ করে দিয়েছে। স্ত্রীজাতির কাছে স্বামীই একমাত্র

অবলম্বন এই চিরন্তনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। স্বামী ভিন্ন নারীর জগৎ অন্ধকার। সেকথা একটি নীতি কথা দ্বারা কাহিনীতে উঠে এসেছে। কবি যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বন্ধন নীতিকে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে বার বার সুযোগ বুঝে তুলে ধরেছেন। কবি যেন শ্রোতা-সমাজের কাছে সমাজের এই বন্ধন নীতির কথা লোকসাংবাদিকতা করেছেন। তার পরিচয় কবি দিয়েছেন এইভাবে —

''মাতা পিতা ভাই বন্ধু কার কেহু লয়।
সকল জানিবা মাত্র পথের পরিচয়।।
স্বামী ইষ্ট স্বামী মিত্র স্বামী বন্ধুজন।
স্বামী বিনা অন্ধকার এ তিন ভুবন।।
সতী নারীর স্বামী নারায়ন সমতুল।
পরার পুরুষ দেখে শিমলির ফুল।।''[২৫৪]

সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বলার আগে কবি পাঠককে পরবর্তী ঘটনার একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাস দিয়েছেন। দেবী চণ্ডী শ্বেত মাছি রূপ ধারণ করে খুল্লনাকে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার পরবর্তী ঘটনার কথা উল্লেখ করা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। দেবী চণ্ডী নিজেই শ্রীমন্তের যাত্রা পথের কাণ্ডারী হয়েছে। তার যাত্রা কালে যে শুভ সংকেতের নির্দেশ পাওয়া যায়, তা লোকবিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ সহ উচ্চবিত্তের শিক্ষিতরাও এই লোকবিশ্বাস দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিল। শ্রীমন্ত তার যাত্রাকালে কাক, শকুন, কোকিলের ডাক শোনা এবং সুন্দর গোয়ালিনীর মাথার দুধের পসার নিয়ে আগ বাড়িয়ে যাওয়াকে শুভ মনে করে। কবি তার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —

''শ্রীমন্ত জাত্রাকালে কাক ডাকে কুতূহলে
শুকুনি ডাকে ডালে বসিয়া।
শুন্যে থাকি পদ্মা ভবানীর তরে বোলে
মাহেন্দ্রক্ষণ জায় বহিয়া।।
শ্রীমন্তের জাত্রাকালে কাক ডাকে কুতূহলে
কোকিল ডাকে ডালে বসিয়া।
সুন্দর গোয়ালিনী মাথে দধির পসার
জাইছে শ্রীমন্তের আগ বাড়িয়া।।''[২৫৫]

শ্রীমন্ত যেসকল ডিঙ্গা নিয়ে যাত্রা করেছে তার সঙ্গে পূর্বের সপ্তডিঙ্গার নামের কোন মিল নেই। এখানে কর্ণ, উদরতারা, চন্দ্রখোলা, শাশিয়া, ধুমকুরা, যাত্রা সিদ্, হরিহরা প্রভৃতি সপ্তডিঙ্গার নামের

উল্লেখ রয়েছে। সপ্তডিঙ্গা নিয়ে শ্রীমন্তের যাত্রাপথের একটি সুন্দর ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রা পথে নদীয়ার কথার প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের হরিনামের উল্লেখ রয়েছে। তবে সুনীলকুমার ওঝা এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। তিনি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পাদটীকায় বলেছেন— ''প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।''[২৫৬] এই প্রক্ষিপ্ত অংশের পর শ্রীমন্তের তিন দিন নদীয়ায় অপেক্ষা করার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অংশটি কাব্যের প্রক্ষিপ্ত নয়। এখানে এসে শ্রীমন্ত সিংহলে বন্দী পিতার কথা বিস্মৃত হয়। যদিও আমরা লক্ষ্য করি খুল্লনা শ্রীমন্তকে পিতার সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত দিয়ে দেয়। তাই মনে হয়, শ্রীমন্ত চরিত্রটি যতটা আত্মশ্লাঘা নিয়ে সিংহলে পিতা উদ্ধারের জন্য রওনা হয়েছিল নদীয়ায় এসে তার মনে সেই ইচ্ছা তত তীব্র থাকে নি।

তবে শ্রীমন্তের দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজায় তন্ত্রের দেবীর পূজা পদ্ধতির রীতিগুলিকে মান্য করা হয়েছে। এভাবে শ্রীমন্ত মগরায় এসে উপস্থিত হলে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সাধারণ রীতি অনুয়ায়ী দেবীর ছলনার বিষয়টির আগমন ঘটে। সেই সূত্রে দেবী চণ্ডীর ইন্দ্রের সভায় মেঘ আনয়নের জন্য যাত্রা। তাই কাহিনী মর্ত্য ভূমি থেকে সামান্য সময়ের জন্য স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে স্বর্গের দেব-দেবীদের আচরণকে মর্ত্যের তথা গ্রাম্য পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে। দেবতা চরিত্র গ্রাম্য সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছে। মর্ত্যের ধূলি-ধূসরিত জীবনে ইন্দ্র চরিত্রটি হয়ে উঠেছে আমাদের পরিচিত জগতের কোন এক জমিদার মানুষের প্রতিভূ। চণ্ডী ইন্দ্রের কাছে মেঘ চায় এবং সে সময় ইন্দ্রের প্রকাশ ভঙ্গি তার পরিচয় বহন করে। ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিচিত্র প্রকার মেঘের আগমন এবং তাদের প্রকাশভঙ্গি কাহিনীকে সজীবতা দান করেছে। সরস হাস্য রসিকতার উদ্রেক ঘটেছে এখানে। তাদের গর্জনে বর্ষণে শ্রীমন্তের প্রাণপণ অবস্থা। সে বিপদ শঙ্কুল অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অনিবার্য কারণ বশত দেবীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেবী চণ্ডীকে শক্তির আধার, কালি, ছত্রিশ নয়ান, চৌষট্টি যোগিনী ও প্রকৃতি ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেবীর প্রকৃতি রূপ সম্পর্কে বলেছেন — "We find that the primordial Lord (Adi-deva) was thinking of creation in the void, and when he was thus pondering on, Prakrti came out of his body, and Prekrti, who was the manifestation of the power (Sakti) of the Adi-deva, was called the Adi-devi."[২৫৭] তন্ত্রে এই আদি দেবীকে প্রকৃতিরূপিনী বলা হয়ে থাকে। সে যাইহোক, নায়ক সম্মুখ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দেবীর উদ্দেশ্যে এই চৌতিশা মঙ্গলকাব্যের একটি সাধারণ রীতি। মগরায় শ্রীমন্তের চণ্ডী স্মরণেও শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের সমাধাসূত্র পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে কাব্যের এই অংশটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কবি বলেছেন —

''আন২ অহে কণ্ডার আদ্যের তুলসী।

এই গয়া এই গঙ্গা এই বাণারসী।।
শ্রীদুর্গার নাম কিছু করিল স্মরণ।
জন্মের সাফল হবে শুনহ বচন।।
তুলসীর মাল্য সাধু গলায় পহ্রিল।
শ্রীবিষ্ণু বলিঞা জল মুখে তুল্যা দিল।।"[২৫৮]

শ্রীমন্ত বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দুর্গা বা চণ্ডীর নাম স্মরণ করার পাশাপাশি গলায় তুলসীর মালা প্রদান করে বিষ্ণু নাম করার মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণবধর্মের মিলনকে প্রকাশ করে। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "বৈষ্ণব সাধক-কবিগণই প্রথম কলিযুগের গুণ-কীর্তন করেন। সে যুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া হরিনাম প্রচার করিয়া মানব মাত্রেরই মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সে যুগ সকল যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ... চণ্ডীর মুখে হরিনামের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া তেমনি শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা করিয়াছেন।"[২৫৯] তবে এখানে চণ্ডীকে নয়, সাধক বা ভক্ত শ্রীমন্তের মুখে বিষ্ণু নাম স্মরণ করতে দেখি। ভক্ত শ্রীমন্ত এখানে স্বভাবাচরণে একান্তই বাঙালী। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে আমরণ জীবনযুদ্ধ পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ; বাঙালী সেখানে অবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করে পালিয়ে বেড়ায়। শ্রীমন্ত চরিত্রটিও তেমনি বাঙালী মানসের অন্তরের প্রকাশ। সে মগরার সংকটে পড়ে পিতা, মাতা, দুর্বলা দাসীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করে শেষে নিজেকে জলে সমর্পণ করে দিয়েছে। সে সময় চণ্ডী তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করে। দেবী চণ্ডীর মাতৃ স্বরূপটি এখানে স্পষ্ট। দেবী চণ্ডীর উগ্রমূর্তির পাশাপাশি স্নেহের বা বাৎসল্যের রসধারা সঠিক সময়ে ঝরে পড়েছে। দেবী চণ্ডীর শ্রীমন্তের প্রতি এত স্নেহ মাতা খুল্লনার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় না। শ্রীমন্ত দেবীর নিদান লাভ করে পুনরায় যাত্রা শুরু করে। সেই পথে সাপাদহ, কড়িদহ, শঙ্খদহ, কাকড়াদহ, জকদহ, হাতিদহ, কুম্ভীরদহ প্রভৃতি এক একটির বিস্তৃত বিবরণ কাহিনীর গতিকে ভারাক্রান্ত করে।

অতঃপর কাহিনীর স্বাভাবিক ধারানুযায়ী কালিদহের কথা আসে। সেখানে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী শ্রীমন্তের কমলে কামিনী দর্শন বিষয়টির আগমন ঘটে। সেখানে বলা হয়েছে —

"দুর্গার মায়াতে কাল কালিদহের জল।
কালিদহতে রূপি দিলেন কমল।।
কমলের পত্রে বসি দুর্গা কায়া কৈল।
কমলের নবীন ডাণ্ডি অকস্মাৎ হৈল।।
জোগিনীকে আজ্ঞা কৈল আদ্যা ভবানী।
কমলের নবীন পত্র হইল জোগিনী।।

মায়াতে কমল ফুল হৈল বিপরীত।
জলতে কমল হৈল অতি সুশোভিত।।
জলতে হইল হস্তী দুর্গার মায়াতে।
মায়াহস্তী জলে আল্য জল খাইতে।।
অতি ভয়ঙ্কর হস্তী হৈল মায়া বলে।
পর্ব্বত সমান হস্তী শুণ্ড দিল জলে।।

*　　　*　　　*

নবীন কামিনী বেষে　　　মায়া করি ঘন হাসে
রূপ দেখি মুনিগণ ভুলে।।
বছর ষোড়শা নারী　　　সেই প্রায় রূপ ধরি
গজকে ধরিঞা করি গ্রাস।''[২৬০]

অনুরূপ দৃশ্য ধনপতিও কালিদহে দেখেছিল। সেই সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন — ''চণ্ডী-মঙ্গল-বর্ণিত এই কমলে কামিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষ্মীর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূর্তি অতি প্রাচীন; ... বাণিজ্যসূত্রে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গিয়া বাঙালীগণ এই গজ-লক্ষ্মীর সহিত পরিচিত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী-মঙ্গলের এই 'কমলে কামিনী'। এই শ্রী বা লক্ষ্মী সৃষ্টিরূপিণী; সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনীশক্তির প্রতীক-রূপে গৃহীত।''[২৬১] দেবী চণ্ডীর গজ লক্ষ্মীর পদ্মে অবস্থান ও পদ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং হাতির তাতে জল প্রদান করার মধ্যে উর্বরতা বা সৃষ্টি কাল্টের আভাস রয়েছে বলে মনে হয়। তবে এই উর্বরতার দেবী স্বরূপত দেবী চণ্ডীর তুলনায় স্বতন্ত্র। তার বহু রঙ রূপের কথা কবি দ্বিতীয় বার বলে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছেন। কাহিনী ধারা থেকে দেবীর বিচিত্ররূপের দৃশ্য সরিয়ে নিলেও কাহিনীর মধ্যে সংযোগসুত্র বা ধারাবাহিকতা বিনষ্টি হবে না, অনুমান করা যায়।

কালিদহের এই অলৌকিক দৃশ্যের পর কাহিনী বাস্তবে পদার্পণ করে। শ্রীমন্ত কালিদহের থেকে রত্নমালার ঘাটে উপস্থিত হয়। জলপথে শ্রীমন্তের আগমনে সিংহল রাজা শালবান শঙ্কিত হয়েছে। রাজার এই শঙ্কায় মধ্যযুগে জলদস্যুদের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে অসম্ভবের কিছু নয়। কিন্তু শ্রীমন্ত অপরিচিত জল দস্যু বা আগ্রাসী কোন ব্যক্তি ছিল না। সে সিংহলে বানিজ্য করতে এসেছে, তবে মূল উদ্দেশ্য পিতার অনুসন্ধান করা। কিন্তু কোতাল তাকে সিংহল আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে পরিস্থিতি বুঝে চন্দন কেনার কথা বলে। আপাত মনে হতে পারে, শ্রীমন্তের উত্তর তার আগমনের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তবে কোতালদের কাছে তার পদার্পণের মূল উদ্দেশ্য গোপন করার মধ্যে শ্রীমন্ত চরিত্রের বিচক্ষণতা ও পরিস্থিতির সঙ্গে তার বক্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়েছে।

শ্রীমন্তের সিংহল রাজার সঙ্গে সাক্ষাতে যে সকল ভেট-জাত দ্রব্যের উল্লেখ আছে তা কবি উত্তরবঙ্গ তথা মালদহ জেলার উপযোগী করে বিবৃত করেছেন। সেখানে বারোমাসের আম ও তালের কথা রয়েছে। এই ভেট-জাত খাদ্য সামগ্রী প্রসঙ্গে মালদহের বিখ্যাত আম ও তালের কথা মনে আসে। তবে নারিকেল নিয়ে রাজা শালবানের অপরিচিত শ্রীমন্তের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সমকালীন ক্ষণপরিবর্তনশীল, পুনঃ পুনঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং আগন্তুকের দ্বারা সাম্রাজ্যগ্রাসের অবিশ্বাসের দিকটির সঙ্গে ঐক্য রয়েছে। তাই সমকালীন প্রেক্ষাপটে নবপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তির সঙ্গে রাজার এই আচরণ খুব স্বাভাবিক।

এই রকম হালকা পরিচয় পর্ব অতিক্রম করে কাহিনী মূল পরিচয় পর্বে প্রবেশ করে। শ্রীমন্তের বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদানের পরই দেবী চণ্ডীর পূর্বোল্লেখিত পিতার সঙ্গে পুত্র সাক্ষাৎ এবং সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। সে সময় চণ্ডী সিংহল-রাজ শালবানকে শ্রীমন্তের প্রতি সন্দেহভাজন স্বপ্ন দেখবার বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই অলৌকিক স্বপ্নই কাহিনীকে মূল পথে নিয়ে যায়। দেবীর এই স্বপ্ন বা অলৌকিকতা শালবান ও শ্রীমন্ত চরিত্রকে পরিচালিত করেছে। তাতে উভয়ের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দেবীর সন্দেহ জাগ্রতকারী স্বপ্নে রাজা শালবান শ্রীমন্তকে যখন ধরে আনে তখন শ্রীমন্ত তার পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বংশ ও রাজ্যের পরিচয় প্রদান করে। এই পরিচয় প্রসঙ্গান্তরে কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ শ্রীমন্তের কালিদহের কমলে-কামিনীর ঘটনা উত্থাপন এবং কমলে-কামিনী মিথ্যা প্রমাণ হলে তার বন্দী ও সপ্তডিঙ্গা বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শালবান তাকে মশানে কাটার ও সপ্তডিঙ্গা বাজেয়াপ্তের ঘটনাকে প্রমাণ পত্রে লিখে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শ্রীমন্ত কমলে-কামিনী দেখাতে না পারায় সাক্ষী চরিত্র হিসাবে কর্ণধার রাজাকে বলে —

“সত্য সম ধর্ম্ম নাঞি লেখ্যাছে পুরাণে।
মিথ্যার সমান পাপ নাঞি ত্রিভুবনে।।
সাক্ষী হঞা জেবাজন মিথ্যা কথা চলে।
সপ্ত পুরূষ তার নরকতে চলে।।”[২৬২]

কাণ্ডারের মুখে এই নীতিকথা সমাজকে সতর্কীকরণ ও সত্যের পথে চলার বার্তা বহন করে। বিপরীতে শ্রীমন্তের মিথ্যা কথায় তাকে মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মশানে মৃত্যুর আগে সে গঙ্গার জলে স্নান করে পূণ্য সঞ্চয় করতে চেয়েছে এবং সকল আত্মীয়-পরিজনদেরকে একে একে তর্পণ করেছে। তবে লক্ষণীয়, আত্মীয়-পরিজনদের তর্পণের আগে সূর্যকে সে প্রথম তর্পণ করেছে। এটি হিন্দু সমাজেরই রীতি। এই তর্পণ একটু দীর্ঘ ও বিস্তৃত। তর্পণের পালা অতিক্রম করে শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা উচ্চারণ করে। এই অংশে শ্রীমন্ত নায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

মশানে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধারের জন্য দেবীর উদ্দেশ্যে তার এই চৌতিশা স্তব উচ্চারণ। এই চৌতিশায় দেবীকে প্রথমেই কমলা কালী, বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাতে চণ্ডীর কমলা, কালী, গিরিজা কালী, ভবানী, ভৈরবী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাই। এই নামগুলিতে শক্তির বা তন্ত্রের দেবী নামের সাযুজ্য পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করতে পারি — "শাক্তের প্রধান উপাস্য দেবতা দশ মহাবিদ্যা। কালী, তারা, ষোড়শী (ত্রিপুর-সুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা), ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ দেবতা সাধারণত মহাবিদ্যা নামে পরিচিত।"[২৬৩] শিব ও শক্তির একদেহে অবস্থান তন্ত্র ধর্মের ছায়াপাত পড়েছে। অন্যদিকে, এই চণ্ডীকেই ডাকা হচ্ছে নারায়ণী, বারাহি ও বৈষ্ণবী নামে। দেবী চণ্ডীর নামে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে শাক্ত ধর্মের দেব-দেবীর নাম মিলে গেছে। প্রসঙ্গত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কথা স্মরণে আসে — "তন্ত্রে একই দেবতার ও তাহার বিভিন্ন রূপের উপাসনায় অল্পবিস্তর বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। রাম কৃষ্ণ শিব কালী প্রভৃতি দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র, ধ্যান ও উপাসনাপদ্ধতি তন্ত্রগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার বৈষ্ণব দেবতা হিসাবে বিষ্ণু বা নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম, বাসুদেব, বালগোপাল, দধিবামন, লক্ষ্মীনারায়ণ, নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি; ... শাক্ত দেবতা হিসাবে কালী, তারা, ভৈরবী প্রভৃতি বহু দেবতার নাম ও পূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।"[২৬৪] অর্থাৎ শ্রীমন্তের চৌতিশা সম্পর্কে সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের কথায় বলা যায় — "চৌতিশা মূলতঃ বর্ণমালা-গঠিত এই বাগ্‌দেবতারই বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গলের চৌতিশা দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। সেজন্য মনে হয়, চণ্ডীমঙ্গলের দেবীকে বর্ণমালা-গঠিত বাগ্‌দেবতা কল্পনা করিয়াই চৌতিশা দ্বারা তাঁহার বন্দনা করার রীতি এই মঙ্গলগানে প্রচলিত হইয়াছিল।"[২৬৫] সুধীভূষণ ভট্টাচার্য দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থে এই বাগ্‌দেবীকেই তন্ত্রের দেবী বলেছেন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চৌতিশায় দেবী চণ্ডীর মধ্যে তন্ত্রের শক্তিরূপিনী দেবী ও বৈষ্ণব ধর্মের মিলন ঘটেছে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবশ্যক বলে মনে হয়।

শ্রীমন্তের চৌতিশার স্তবে দেবী চণ্ডী জাগরণ ঘটেছে কয়েকটি লৌকিক বিশ্বাসের দ্বারা। স্বর্গের দেবী চণ্ডীকে লোক সমাজে অবস্থিত সাধারণ নর-নারীর পটভূমিকায় অঙ্কন করা হয়েছে। চরিত্র এখানে লোক বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। স্বর্গে চণ্ডীর কপালে টনক পড়া, ডান চোখ নাচা, দাঁতে জিহ্বা কামড় পড়া, চলতে নখে হোঁচট লাগা ও পেঁচা-কাকে মুখোমুখী কথা বলা ইত্যাদিকে অশুভ বলে মনে হয়েছে। চণ্ডী এই অশুভ সংকেতের পর চণ্ডী পদ্মাকে দিয়ে গণিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে। নিজ ভক্তকে উদ্ধারের জন্য তথা চণ্ডীর পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কালীর মত রণ সজ্জায় সজ্জিত হয়। খর্গ, খাপর, বাণ, শিবের শিব কর্তৃক প্রাপ্ত ত্রিশূল, যম কর্তৃক প্রাপ্ত যমদণ্ড এবং ইন্দ্র কর্তৃক প্রাপ্ত রণ-সজ্জা পরিধান করে দেবী যুদ্ধে বের হয়। এই শক্তিরূপিণী দেবীও যুদ্ধ

যাত্রার সময় বাঙালী নারীর মত 'রাম' বা দেবতার নাম স্মরণ করে। কবির কথায় — ''রাম নাম জপি দুর্গা রথে চড়ে গিএগ্রা।''[২৬৬] পরিবেশ অনুযায়ী তার রূপসজ্জা সমঞ্জস্যপূর্ণ হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার এই সংস্কার বোধ তাকে সাধারণ মানবীতে পরিণত করেছে। সে মশানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। ছদ্মবেশে দেবীর কোতালদের সম্মুখে বেদ পাঠ তার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং সেই পাণ্ডিত্যের প্রতিদানে শ্রীমন্তকে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কোতাল তাতে নারাজ হয়। তাই চণ্ডী একাদশীর ব্রত পালনের জন্য অল্প খাদ্য বস্তু চায়। সেই খাদ্য বস্তু হল এক লক্ষ ছাগল, ভেড়া এবং এক লক্ষ মহিষ। কাহিনীতে দেবীর মনুষ্যরূপের মাঝেই স্ফুরিত হয়েছে অলৌকিক দেবী স্বরূপটি। ভক্তকে উদ্ধারের জন্য এই স্বরূপ পরিবর্তন দেবী চণ্ডীর পক্ষে অনিবার্য ছিল। তবে ব্রাহ্মণী ছদ্মবেশী দেবীর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কোতাল যে কথা বলে তা সমাজ অভিজ্ঞতার ফসল। কবি সমকালীন ব্রাহ্মণদের প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই হয়তো তার অঙ্কিত কোতাল চরিত্রটি ব্রাহ্মণ স্বরূপিণী দেবীকে পাপিষ্ঠা বলতে পেরেছিল। সমকালীন সমাজে ব্রাহ্মণদের মাংস খাওয়া পাপ বলে বিবেচিত হত বলে বোধ হয় তার এরূপ মন্তব্য। তাহলে তারা সমাজের কাছে রাক্ষসী ও ডাইনী নামে পরিচিত হত। কিন্তু কোতালের এই ডাইনী অপবাদই তার ভয়ঙ্কর ও উগ্র মূর্তি প্রদর্শনের কারণ। এই উগ্রমূর্তি দেখে কোতালগণ ভীত হয় এবং দেবী শ্রীমন্তকে প্রতিদানে চায়। তারপরই কাহিনীতে শ্রীমন্তের বালকোচিত অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেই বালক শ্রীমন্তকে দেবী চণ্ডী কোলে তুলে নেয়। এখানে চণ্ডীর উগ্ররূপের পাশাপাশি শান্ত মাতৃত্বের স্বরূপটি চিত্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''তন্ত্রে মঙ্গলচণ্ডীর নাম বহু স্থলে পাওয়া না গেলেও মঙ্গলচণ্ডীর অনুরূপ বহু শান্তোগ্র দেবতার কথা তন্ত্রে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে একটিকে মঙ্গলচণ্ডীর তান্ত্রিক রূপ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না।''[২৬৭] দেবী চণ্ডীর মাতৃত্ব স্বরূপের সঙ্গে মানবিকরূপটি কাহিনীতে স্পষ্ট। দেবী চণ্ডী কোতালগণকে শ্রীমন্ত উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তারা দেবীকে চুল ধরে ফেলে দেয়, শ্রীমন্তের সঙ্গে তাকেও প্রহার করে। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তখন দেবী চণ্ডী তার অলৌকিক শক্তির প্রকাশে কোতালদের সমস্ত অস্ত্র বিনাশ করে দেয়। অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায় বলা যায় — ''... এমন শক্তির অধিকারী হ'লে মানুষ যা করত চণ্ডী তা-ই করছেন — সমস্ত অবাঞ্ছিত বিপদ ও অকল্যাণকে দূর করে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করছেন।''[২৬৮] তাই তার চামুণ্ডা উগ্র মূর্তিই যুদ্ধের পটভূমিকায় সামঞ্জস্য বলে মনে হয়।

''চামুণ্ডার বেষে জুঝ সঙ্গে নএগ্রা দানা।
মুণ্ডমালা পহ্র গলে জত রাজসেনা।।''[২৬৯]

দেবী চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে দানাগণকে, বলবীর হনুমান ও জমের পুত্র মঙ্গলাকে স্মরণ করে। সে

তাদের নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করে। লক্ষণীয়, জমের পুত্র মঙ্গলার কথা বলতে গিয়ে মূল কাহিনী বহির্ভূত তার শক্তি সম্পর্কে অতিকথন কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণনাভঙ্গিতে এরূপ মূলকাহিনীর প্রসঙ্গে আগত বর্ণনীয় বিষয়ে বহুবিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কাহিনীতে নতুন নতুন চরিত্রের সংযোগ ঘটেছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের সমাবেশ কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। যেমন, চণ্ডীর দানাগণের নাম কালবাণ ও জলেশ্বর; অপরপক্ষে রাজা শালবানের সেনা রামানন্দ, রঘুবীর, মানসিংহ, কালুদণ্ড, ভীম ও সাম প্রভৃতি চরিত্র। উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিস্তৃত লৌকিক ঝগড়ার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত লাভ করে। তবে দেবী চণ্ডীর চণ্ডালরূপটিই এখানে অধিক স্পষ্ট। বিশেষ করে, তন্ত্রে কালীর উগ্রমূর্তিই বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। শালবান রাজা ও দেবী চণ্ডীর যুদ্ধ অলৌকিক আবহাওয়ায় বর্ণিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত শালবানের সকল সেনাপতি সহ সৈন্যের মৃত্যু হয়। তাতে তার আচরণ বাল্য সুলভ। বাধ্য হয়ে শালবানকে দেবীর স্তব করতে হয়েছে। রাজা দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে সে অত্যন্ত সুন্দর অভিনব ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করে। কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডীর শালবান রাজার কাছে পরিচয় স্বতন্ত্র সংযোজন বলা যেতে পারে। এরূপ পরিচয় প্রদান ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দেবী অন্নদাও পাটনীকে দিয়েছিল। চণ্ডী বলে —

> "পরিচয় শুন তুমি　　সর্ব্বস্থানে থাকি আমি
> 　　গোড় দামুদরে এক ধাম।
> নদিয়াতে নঘড়ি　　সেইস্থানে দুইবাড়ি
> 　　উড়স্যাতে মুনিকট নাম।
> *　　　*　　　*
> সর্ব্বতীর্থ আছে জথা　　দুই বাড়ি আছে তথা
> 　　তথা নাম আদ্যাভবানী।।
> থাকি আমি স্বর্গপুর　　স্বামী মোর মহেশ্বর
> 　　নিত্য স্নান করি গঙ্গাতীরে।"[২৭০]

এই পরিচয় জ্ঞাপক উদ্ধৃতিতে দেবীর পরিচয়ের সঙ্গে মিশে আছে মালদহের আঞ্চলিক সংযোগ সূত্রটি। এইভাবে পরিচয় পত্র দিয়ে মশানের পালা সমাপ্ত করে।

তারপরই দেবী শালবানকে কমলে কামিনী রূপ দর্শন করায়। এই কমলে কামিনী রূপ কোথায় দেখানো হয়েছে তার সদুত্তর কাহিনীর মধ্যে মেলে না। কবি অতিপ্রাকৃত ভাবনাকে কাহিনীতে বেশি স্থান দিয়েছেন। তাই রাজা শালবান কমলে কামিনী রূপ দর্শনের পরই শ্রীমন্ত বিবাহ করতে চাইলে নীলারানীর শত সৈন্যের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। এই

সময় শ্রীমন্ত দেবীকে একলক্ষ ছাগ বলি দেওয়ার পর সৈন্যদের বাঁচিয়ে দিতে বলে। এখানে দেবীর সঙ্গে শ্রীমন্তের ব্যবধান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে দেবীর সঙ্গে মানব চরিত্রের কথোপকথন মঙ্গলকাব্যগুলির স্বাভাবিক রীতি। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে তার অন্যথা হয়নি। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন — "সকল মঙ্গলকাব্যের মতো চণ্ডীমঙ্গলেও দেবতা ও মানুষের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রাখা হয় নাই। বরং দেব ও মানবের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান দেখানো হইয়াছে। ... দেবমানবের এই প্রকারের সম্পর্কস্থলে তাহা অস্বাভাবিক একেবারেই নয়। তাহাতে কাব্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা নয়। কিন্তু সেই ঘটনার মধ্যেও একটা রসশৃঙ্খলা থাকা চাই।"[২৭১] সেই রস শৃঙ্খলা এই কাব্যে রয়েছে। শ্রীমন্তের কথায় চণ্ডী হনুমান কর্তৃক শালবানের সমস্ত সৈন্যদেরকে যমালয় থেকে আনার মধ্যে সেই শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। তাতেই সিংহলে রাজা শালবান কর্তৃক চণ্ডী পূজা প্রচলন হল। চণ্ডীপূজার পরিধি বর্দ্ধিত হল। সিংহলে দেবীর পূজা প্রচলন পর্যন্ত শ্রীমন্তের জীবন অলৌকিকতা দ্বারা প্রভাবিত। কাহিনী এই পর্যন্ত অতিপ্রাকৃতের আলো-ছায়ায় প্রবাহিত হয়।

এরপর কাহিনী গ্রন্থনায় বাংলার গৃহ সংসারের ছোঁওয়া পায়। বঙ্গদেশের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি শ্রীমন্তের জীবনকে দোলা দিয়ে যায়। শ্রীমন্তের সঙ্গে পূর্ব-শর্তানুযায়ী সিংহল-রাজ শালবানের কন্যা সুশীলার বিবাহ বিষয়টি উপস্থিত হয়। বিবাহের জলসাধার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ দিয়ে পুথি পড়ে প্রথমে গণপতির পূজার পর দুর্গার স্তব করা হয়। এখানে চণ্ডী ব্রাহ্মণ দ্বারা উচ্চ হিন্দু গৃহে পূজা পেল। পূজার পর নীলারানীর ধান দুর্বা মাথায় দিয়ে বর বরণ করে নেওয়ার প্রথা পালন বর্ণিত হয়েছে। এদিকে সুশীলার সজ্জা চলছে। সাধারণত আমাদের বাঙালী গৃহে যা হয় তাই এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিবাহের শুভক্ষণ দেখে, বরবরণ, মধুপর্ক, পিতার কোলে বিবাহ মণ্ডপে আসা, শ্রীমন্তের সঙ্গে সুশীলার সপ্তবার প্রদক্ষিণ, মালাবদল এবং বিবাহে বিভিন্ন দানসামগ্রী দান প্রভৃতি ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক দানের দ্রব্য সামগ্রী প্রদান সেকালে আশ্চর্যের বিষয়। সেই সঙ্গে ঋতুদর্শনের পূর্বে বালিকা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার রীতি উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সে যাইহোক, সকলে দান প্রদান করলেও শ্রীমন্ত দানস্বরূপ বন্দীঘর চায়। সে পিতাকে সনাক্তকরণের পরিচয় পত্র দ্বারা বুঝতে পারে। সেই সনাক্তকরণের বর্ণনা ধনপতির মত বণিকের ক্ষেত্রে হাস্যরসাত্মক বলে মনে হয়। কবি লিখেছেন —

"বুকতে লেখিঞা ছিল সাত গোটা তিল।
কপালের দক্ষিনে আছে একটা আচিল।।
মোর পিতা লঙ্ঘিল চণ্ডীর খটখানি।
বাম পাএ গোদ দক্ষিন চক্ষে ছানি।।

পত্র অনুসারে সাধু পিতাকে চিহ্নিল।
জত্ন করিঞা সাধু বন্দীকে রাখিল।।"[২৭২]

বন্দী পিতার প্রতি পুত্রের রুচিশীলতার পরিচয় রয়েছে। শ্রীমন্ত পিতা ধনপতিকে নাপিত এনে শুদ্ধ করে। পিতা-পুত্রের মিলনের পূর্বে উভয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্তি পরিচয় ও অতীতের ঘটনা অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে প্রকাশ করে। শ্রীমন্ত তার এই রাজ্যে আগমণের কারণ বলতে গিয়ে চণ্ডীর সহায়তা ও প্রশংসা করে এবং সে বলে মাতা খুল্লনা চণ্ডীর পরমভক্ত। তার জন্যে মশানে দেবী চণ্ডী তার প্রতি সহায় হয়। একথা শ্রবণে ধনপতি তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় নি। এমনকি, একই গৃহে খুল্লনা শাক্তধর্মের আচার পালন করে আর ধনপতি সেখানে বিপরীত শৈব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এই বিপরীত ধর্মের দ্বন্দ্ব এখানে সম্ভাব্য ও অনিবার্য ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ফলে কাহিনী এখানে অনেকটা সহজ-সরল।

এই সহজ-সরলকাহিনীতে লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রীমন্ত সুশীলাকে নিয়ে শয্যায় যাওয়ার ঘটনাটি। সেই সঙ্গে আসে কাহিনীতে গতিপরিবর্তনের ঝড়। যখন কাহিনীতে চরিত্ররা সুখের গৃহ-সংসার করতে আরম্ভ করে সেই মুহূর্তেই দেবী চণ্ডীর আগমন ঘটে। দেবী চণ্ডী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বদ্ধ জীবনকে নাড়া দিয়ে যায়। তার ফলে কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডীর অলৌকিকতা ঘটনা, চরিত্র ও পটভূমি পরিবর্তনের সহায়ক। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অতিপ্রাকৃত ঘটনার দ্বারা চরিত্র, ঘটনা ও পটভূমি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যে এটা কাহিনী গ্রন্থনার দিক থেকে সাধারণ লক্ষণ বলা যেতে পারে। এখানে শ্রীমন্ত সুশীলার সঙ্গে সিংহলে বিবাহ জীবন সূত্রপাত করলে সেই সময় চণ্ডী খুল্লনার রূপে তাকে স্বপ্ন দেখায়। এই স্বপ্নই শ্রীমন্তকে বিচলিত করে এবং নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে মনস্থির করে। সে উজানীতে যেতে চায় এবং সুশীলা স্বামীর প্রতি প্রীতিবশত বারমাসের দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণাকে বারমাস্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। সুশীলার এই বারমাস্যা বর্ণনার পিছনে কোন কঠোর সামাজিক সমস্যার পটভূমি ছিল না। স্বাভাবিক কাহিনীর ধারায় তা বর্ণিত হয়েছে। তবে, এই বারমাস্যা নর-নারীর অদর্শনে নারী কণ্ঠে উচ্চারিত বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাস। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন — "একদিকে বারমাস্যার শাশ্বত নারীচরিত্রের এই প্রেম-প্রীতির দিক যেমন উদ্ভাসিত, অপরদিকে নারীচরিত্রের অজস্র বিশ্বাস, সংস্কারের দিকটিও বারমাস্যার মধ্যে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে।"[২৭৩] এখানে সুশীলার বারমাস্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার জীবনের সংযোগ, উচ্চবিত্তের পাশা খেলা, ব্রাহ্মণ দিয়ে দুর্গাপূজা করা এবং নবান্ন উৎসব পালনের অনবদ্য আলেখ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়া সুশীলার বারমাস্যা নারী জীবনের অপূর্ব পাতিব্রত্য, আত্মবিস্মৃতিমূলক সেবা ও শুশ্রূষার মধ্যে এর সাহিত্য মূল্য রয়েছে। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায় — "প্রকৃতির সংগে, আকাশ-বাতাস, জল-মাটির সঙ্গে সেদিনের মানুষের সম্বন্ধ ছিল

পরম আত্মীয় অন্তরঙ্গের সম্বন্ধ। প্রকৃতি রাজ্যের বিচিত্র শব্দ ও স্পর্শ, রূপ ও রস মানবমনে জাগাতো বিচিত্র ভাব ও সুর। বর্ষা-বসন্ত-শরতাদি ঋতু প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি ও রূপলীলা মানুষের কাছে ছিল শোকে সান্ত্বনা, বিপদে আশা ও আশ্বাস এবং উৎসবে, সম্পদে আনন্দ ও উল্লাসের অনন্য উৎস। তাই বারমাস্যা সাহিত্যের নরনারীর ভাষা মানুষ ও প্রকৃতির সহজ মিলন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাপ্রসূত অন্তর্গাঢ় প্রাণরস সিঞ্চিত সহজ ভাষা। এদের ভাষা, শিল্পবোধ, সারস্বত ধ্যান-চর্চা-সঞ্জাত নয়, অনায়াস জাত, প্রেমসিক্ত চিত্তের সহজ ও অনিবার্য ধ্বনিময় অভিব্যক্তি।''[২৭৪] সুশীলা বারমাস্যায় এই প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র ধ্বনি স্বামীর প্রতি তার আশ্বাস ও আনন্দে, উল্লাসে অতিবাহিত করার উপায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই সুশীলা স্বামী শ্রীমন্তের উদ্দেশ্যে বলে —

''চৈত্রমাসে একস্থানে থাকিব শুইঞা।
সুশীলার তরে প্রভু না জাবে ছাড়িঞা।।
বৈশাখের কথা শুন সাধুর নন্দন।
কুমকুম কস্তুরী দিব আগর চন্দন।।
জ্যৈষ্ঠ মাসতে প্রভু প্রচণ্ড তপন।
দলিচা ফেলিয়া প্রভু করিব শয়ন।।
*　　　*　　　*
আশিনে দুর্গার পূজা শুনহ বচন।
ব্রাহ্মণে লইঞা সাথে করিহ পূজন।।
কার্ত্তিক মাসের কথা শুন একবারে।
আনাব তোমার মাতা সিংহল নগরে।।
অগ্রাহন মাসে হবে হেমন্ত ধান্য।
নানা সুখ ভোগে প্রভু করিহ নবান্ন।।''[২৭৫]

তার বারমাস্যায় অন্তর্জগতের শূন্যতাকে উচ্চবিত্তের বিভিন্ন উৎসবের আনন্দ সিঞ্চন দ্বারা অতিবাহিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। সুশীলার দুঃখ-কষ্ট প্রকৃতি রাজ্যের সঙ্গে এবং বিভিন্ন আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে জীবনের সংযোগ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা চিরস্মরণীয় বলে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত, শ্রীমন্তকে সুশীলার বারমাস্যার ইচ্ছাকে অতিক্রম করে উজানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। তার যাত্রায় সিংহলের সকলের শোক অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলে মনে হয়। পিতা-মাতা, ভাই, বান্ধব ও আত্মীয় পরিজন জামাতার অদর্শনজনিত হৃদয়ের টানে তাদের শোকে আচ্ছন্ন করতে পারে তা স্বাভাবিক। কিন্তু রাজার পাত্র-মিত্রসহ সিংহলবাসীর শ্রীমন্তের ফিরে যাওয়ার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ার মধ্যে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত

রাম-সীতার বনবাস যাত্রার ছায়া এখানে পড়ে থাকবে। এরপর শ্রীমন্ত পিতা ও স্ত্রীকে নিয়ে নিজ দেশে যাত্রা করে। যাত্রা পথে মগরার বিবরণে অকস্মাৎ ধনপতির বাক্স্ফূর্তি আমাদের হতচকিত করে। কাহিনীতে আমরা লক্ষ্য করি যে, শ্রীমন্তের সিংহল আগমন পিতা ধনপতিকে উদ্ধারের জন্য, কিন্তু কাহিনীতে সেই সময় থেকে ধনপতির কোন স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। মগরার বিবরণে তার বাক্স্ফূর্তি সত্যিই অবাক ও আশ্চর্যের বিষয়। সমাজপতি হিসাবে ধনপতির জবাবদিহি ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ সঙ্গত। তার এই কথায় সুশীলার চণ্ডীর পূজার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। দেবী পূজায় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব পাওয়া যায়। রজো গুণের অধিকারী জবা ফুল ও আদ্যের মন্ত্র দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজার বিবরণ তার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। কবি বলেছেন —

> ''পূজার জতেক দব্য করিল সাজন।
> জবা পুষ্প দিঞা পূজে দুর্গার চরণ।।
> আদ্য মন্ত্রে সুশীলা চণ্ডীকে স্মরিল।
> আসিঞা জগত মাতা দরশন দিল।।''[২৭৬]

সুশীলার পূজায় তুষ্ট চণ্ডী ধনপতির সপ্ত ডিঙ্গাসহ সকলকে উদ্ধার করে। কাহিনী গ্রন্থনায় এখানে রামায়ণের প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। চণ্ডী গরুড় দ্বারা মগরায় হারানো সম্পদ ধনপতিকে ফিরিয়ে দিল। পুত্র-পুত্রবধূসহ পিতা ধনপতি উজানীতে ফিরে এল। তাদের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা জানতে পেয়ে খুল্লনা এয়োগণকে নিয়ে 'বহিত' বা নৌকা পূজা করতে যায়। এয়োরা কাহিনীতে চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং খুল্লনা পুত্রবধূকে বরণ করে নিল। এদিকে ধনপতি আগর চন্দন, প্রবাল, চামড়া ও শঙ্খ নিয়ে উজানীর রাজা বিক্রমকেশরকে ভেট দিতে যায়। কিন্তু কেন যায় তার কোন কার্যকারণ সূত্র মেলে না। দীর্ঘদিন পর দেশে আসার পর সংসারের প্রতি তার কোন গভীর আকর্ষণ দৃষ্ট হয় না। আসলে ধনপতিকে সমগ্র কাহিনীতে কোথাও সংসারানুরাগী বাঙালী গৃহকর্তার আচরণের অভিব্যক্তি মেলে না। তাই এখানে দীর্ঘ বারবছর পরেও তার সংসারে প্রবেশের তুলনায় রাজদরবারে ভেট দেওয়াই বড় হয়ে দাঁড়ায়। কাহিনীর গতিমুখ অনুযায়ী চরিত্রটি পরিচালিত হয়েছে। তাই চরিত্রটি কাহিনী গ্রন্থনায় ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পারে নি।

কিন্তু বিক্রমকেশর চরিত্রটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাজাকে ভেট দেওয়ার সময় ধনপতির মাধ্যমে সে সমস্ত পূর্বঘটনা শ্রবণ করে। তাই সিংহল রাজা শালবানের প্রতি তার অনুরূপ ভাবে অন্তরে হিংসাত্মক মনোভাবনা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিক্রমকেশর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। সেই ঈর্ষার ফলস্বরূপ সে ধনপতিকে বন্দী করে। সেই সময় শ্রীমন্ত পিতাকে সন্ধান করতে উজানী নগরের রাজ দরবারে যায়। রাজা বিক্রমকেশর সিংহল রাজার ন্যায় কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের সঙ্গে বিবাহ এবং রাজ্যের অর্ধাংশ দান করে।

খুল্লনার এই বিবাহে সহমত দেওয়া অস্বাভাবিক ঠেকে। খুল্লনা নিজে সতীন সমস্যায় হৃদয়ের যন্ত্রণা এবং যার পর নাই শাস্তি ভোগ করেও পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া তার চরিত্র অঙ্কনের পরিকল্পনায় অসংগতি বলে মনে হয়। কবির কথায় —

''খুলনা বলেন বাছা শুনহ বচন।
হস্তে পাইলে চন্দ্র ছাড়ে কুনজন।।''[২৭৭]

কিন্তু সুশীলা শ্রীমন্তের বিবাহ বার্তা শুনেই হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলার মধ্যে। তার মধ্যে সত্যাসত্য বিচার করার অবকাশ দেখা যায় না। কিন্তু বিবাহের পূর্বে শ্রীমন্ত জয়াবতীকে সুশীলার দাস করে রাখবার প্রবোধবচন শুনিয়ে যায়। বিবাহের পর সংসার ধর্মের বা সংসার জীবনের কোন আভাস পর্যন্ত নেই। কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য দেবীর পূজার প্রচার। সেই কারণে পূজা প্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন অঙ্কনে বিরলতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চার রাজ্যের চার নারীর দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার করাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল অভিসন্ধি ছিল। কবি লিখেছেন —

''চারিরাজ্যের চারিজন একত্র হইল।
দুর্গাকে পূজিতে সভে একচিত্ত কৈল।।''[২৭৮]

শ্রীমন্ত কর্তৃক পিতার সম্মুখে একে একে চার যুগে চণ্ডীর পূজা ও তার ফলশ্রুতি তুলে ধরলে ধনপতি দেবী চণ্ডীর পূজা করে এবং ষষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে। পূজা করার পর দেবীর বরে তার গোদ ও চোখের ছানি দূর হয়। ধনপতির সম্মুখে দেবী চণ্ডী স্বীয় পরিচয় প্রদান কালে তার দ্বারা শিব পূজার কথা বলে। ''ত্রিতীয় প্রহরে জাঙ্ শিব পুজিবারে।।''[২৭৯] এখানে শিব ভক্ত ধনপতি শক্তি দেবীর পূজা এবং শক্তিদেবীর শিব পূজার মধ্যে দুই ধর্মের সমন্বয়বাণী ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে হয়। এভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমন্বয়ের এক সুর ধ্বনিত করে কাহিনী সমাপ্তির দিকে যাত্রা করেছে।

এবার কাহিনীতে স্বর্গ যাত্রার পালা আসে। তাই দেবী চণ্ডীর ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন হলে খুল্লনা, শ্রীমন্ত, জয়া ও সুশীলাকে নিয়ে স্বর্গে যাত্রা করে। এখানে মর্ত্য সংসার ত্যাগ করে যাওয়ার তারা কষ্ট অনুভব করে না। কেবল খুল্লনা স্বামীর জন্য একটু কষ্ট প্রকাশ করে এবং লহনার কাছে তার সমস্ত ভার দিয়ে যায়। লক্ষণীয়, ধনপতি ও লহনাকে চণ্ডী মর্ত্যভূমি থেকে উদ্ধার করে নি। তারা মর্ত্যেই থেকে যায়। কেন করেন নি তার কোন সুস্পষ্ট জবাব কবি কাব্যে দেন নি। তা কাহিনী গ্রন্থনায় অত্যন্ত রহস্যজনক বটে। কাব্যের শেষে তথা ধনপতি খণ্ডে এরূপ রহস্য রেখেই কবির ব্রতকথার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আখেটিক খণ্ড বা ব্যাধ খণ্ডের শেষে কোন ব্রতকথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে কালকেতু নামক এক ব্যাধের দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার পায়।

আর ধনপতি বা বণিক খণ্ডে নারীর দ্বারা দেবীর পূজা প্রচার বিস্তার লাভ করেছে। লক্ষণীয় যে, মানিক দত্তের কাব্যের শেষে 'ব্রতকথা' বলে একটি অংশই রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে —

"সোমবারে সর্ব্বলোক পূজিহ আপুনি।
মনের বাসনা পূর্ন করিবে ভবানী।।
পূজার নিয়ম কথা শুন সর্ব্বজন।
করিহ দুর্গার পূজা হবে পুত্রধন।।
ব্রতকথা শুনি সভে করহ প্রনতি।
গাইল মানিক দত্ত মধুর ভারতী।।"[২৮০]

অর্থাৎ, ব্রতকথা পালন করলে মনের বাসনা পূর্ণ হবে। সেই বাসনা হল পুত্র সন্তান। যা পারিবারিক সুখ-শান্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সেই উদ্দেশ্যকে সমানে রেখে রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ব্রতকথার পার্থক্য বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য ব্রতকথার কয়েকটি লক্ষণ তুলে ধরেছেন — "ব্রতকথার ভিতর দিয়া নারীজীবনের ব্যক্তিগত নানা ঐহিক কামনার অভিব্যক্তি দেখা যায় — মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-চেতনা রূপলাভ করে। ব্রতকথার আবৃত্তি পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্তু মঙ্গলগান বৃহত্তর সামাজিক অনুষ্ঠান।... একটির ভিতর দিয়া পারিবারিক জীবন ও অপরটির ভিতর দিয়া গোষ্ঠীজীবন প্রতিফলিত হইয়া থাকে।"[২৮১] সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে এখানে ব্রতকথার মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত রূপে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — "ব্রতকথার প্রধান ধর্ম সংক্ষিপ্ততা, বর্ণনার বাহুল্য ইহাতে সাধারণত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ইহা মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; কারণ, সংক্ষিপ্ততা স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে।"[২৮২] তাঁর কাব্যে ব্রতকথার এই বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। এই কাব্যটি মৌখিক সাহিত্যের ন্যায় অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। কাহিনী গ্রন্থনা অনেকাংশে লোকপ্রত্যয়, লোকবিশ্বাস, লোকগল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, হরিপদ চক্রবর্তী সুনীলকুমার ওঝার সম্পাদিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কবি মানিকদত্ত প্রসঙ্গে' অংশে বলেছেন — "কাহিনী বিন্যাসে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে যে রূপকথা, লৌকিক কাহিনী, লোকায়ত প্রত্যয়ের মিশ্র প্রকাশ আছে তা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলে বিরল। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য-ধারায় প্রাচীন রূপটি ইহার মধ্যে অধিকতরভাবে বিদ্যমান।"[২৮৩] যার ফলে কবি প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঠামো তৈরী করার জন্য মূল কাহিনী অতিক্রম করে কখন কখন দেবীর অলৌকিক মহিমা ও স্বরূপের প্রতি বেশি দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি অযথা কাহিনীতে অতিরিক্ত চরিত্রের বাহুল্য এনেছেন। তাতে ঘটনা বিস্তারিত হয়েছে। তার ফলে কখন কখন সেই সকল অতিরিক্ত চরিত্রগুলি নিয়ে ছোট ছোট উপকাহিনীর সৃষ্টি হয়ে যায়। এছাড়া পুরাণ অবলম্বনে ঘটনা ও

চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি অলৌকিক ঘটনা দ্বারা অচ্ছন্ন হওয়ায় তাদের প্রকৃত মানবিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো কবি সামাজিক সতর্কীকরণ, লোক সমাজের আকর্ষণের প্রতি এবং লোকমানসে দেবতার প্রভাবের উপর অধিক দৃষ্টিপাত করার জন্য কাহিনীর বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক (Clossness of reallife) অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাতে ঘটনা ও বিষয়বস্তু তাঁর কাব্যের লক্ষ্য হয়েছে, উপলক্ষ্য হয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ। তবে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সম্পর্কিত রীতি-নীতি-আচারগুলি বাস্তব সম্মত বলে মনে হয়। সতীন সমস্যার দৃঢ়বাস্তব ঘটনারও বর্ণনা কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। প্রথম খণ্ডে কবি কাহিনীকে পূর্ণ বৃত্তাকারে সম্পন্ন করতে না পারলেও শেষের খণ্ডে শ্রীমন্তের দ্বারা তা পূর্ণ করেছেন। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের কবি মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় অনেকাংশে গতিশীলতা লাঘব, অনিবার্যতা লঙ্ঘন, অসম্ভব ঘটনার সংস্থান করেছেন বটে। তবে এই কাহিনী গ্রন্থনা পাঠককে অত্যন্ত কৌতূহলী ও গঠনকৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কাহিনী গ্রন্থনার স্তম্ভ হল চরিত্র। চরিত্র ছাড়া প্লট বর্ণিত হতে পারে না। তাই কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য চরিত্র। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সেই চরিত্র বিশ্লেষিত হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Aristotle; Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, S. H. Butcher's translation, Kalyani publisheers, New Delhi, reprinted, 2001, chap I, p. 7.

২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃ. ১১-১২।

৩। J. A. Curddon; Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, Penguin Publishers, 1999, p. 676.

৪। Aristotle; Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, S. H. Butcher's translation, Kalyani publisheers, New Delhi, reprinted, 2001, chap VII, p. 31-33.

৫। Id; Chap VIII, p. 33-35.

৬। Id; chap XXIII, p. 89 .

৭। E.M. Forster; Aspects of the Novel, Penguin Books, Reprinted 1963, 1964, p. 93-94.

৮। Id.

৯। Id; p. 95.

১০। শ্যামাপ্রসাদ সরদার; প্লট, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৬৭, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃ. ১৫০।

১১। অলোক রায়; সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৬৭, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃ. ৭২।

১২। Aristotle; Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, S. H. Butcher's translation, Kalyani publisheers, New Delhi, reprinted, 2001, chap X, p. 39.

১৩। Id; p. 39-41.

১৪। শ্যামাপ্রসাদ সরদার; প্লট, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৬৭, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০০৬, পৃ. ১৫২।

১৫। কুন্তল চট্টোপাধ্যায়; সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৯৫, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৩, পৃ. ১৪৯।

১৬। তদেব।

১৭। তদেব।

১৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৮৭।

১৯। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, একাদশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১১, পৃ. ৩৫।

২০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১।

২১। তদেব।

২২। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক; রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ৬৯-৭১।

২৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২

২৪। তদেব; পৃ. ৩।

২৫। তদেব; পৃ. ৪।

২৬। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ৮৩।

২৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫।

২৮। তদেব; পৃ. ৭।

২৯। তদেব; পৃ. ৮।

৩০। তদেব; পৃ. ১০।

৩১। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত বিষ্ণুপুরাণম্, দ্বিতীয়াংশ, অষ্টম অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৯০, পৃ. ১৪৭।

৩২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০।

৩৩। সুকুমার সেন সম্পাদিত; বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৮, পৃ.৫।

৩৪। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড), ৫৬ অধ্যায়, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন যন্ত্রে নটবর চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, ১৩২৬ সাল, পৃ. ৬৯৭।

৩৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৪।

৩৬। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ৭১৪।

৩৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬।

৩৮। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০, অষ্টম আনন্দ মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ১১২।

৩৯। তদেব; পৃ. ৪৫৭।

৪০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬।

৪১। তদেব; পৃ. ১৭।

৪২। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৮৮।

৪৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭।

৪৪। শম্ভুনাথ কুণ্ডু; প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি,

১৯৯৬, পৃ. ৩৪৩-৪৪।

৪৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭।

৪৬। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬৪, পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০, পৃ. ৩৫-৩৬।

৪৭। শম্ভুনাথ কুণ্ডু; প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৪।

৪৮। Alige Getty; Ganesa (A monograph on the Elephant Faced God), Munshiram Monoharlal, New Delhi, First Published in 1936, Second edition, December, 1971, p. 1.

৪৯। শম্ভুনাথ কুণ্ডু; প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮৫-৮৬।

৫০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮।

৫১। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; মহাভারতম্ (জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণম্), কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীতম্, বনপর্ব্ব, ১০ অধ্যায়, বিশ্ববাণী প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৩৪-৩৫।

৫২। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; স্কন্দ-পুরাণম্, মাহেশ্বর খণ্ডম — কেদার খণ্ডম্, ২৭ অধ্যায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস বিরচিতম, অনুবাদক তারাকান্ত দেবশর্মা কাব্যতীর্থ, বঙ্গবাসী-ইলেকটো-মেশিন-প্রেসে নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১৮ সাল, পৃ. ১৬২।

৫৩। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত; কালীদাসের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, দশম সর্গ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিশেষ পরিবর্ধিত-পরিশোধিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ হতে পুনর্মুদ্রণ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৭, পৃ. ১৭৩।

৫৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮-১৯।

৫৫। তদেব; পৃ. ১৯।

৫৬। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, ৮১ অধ্যায়, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩২৫।

৫৭। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দেবী-ভাগবত (বঙ্গানুবাদ), তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন

মন্ত্রে, নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩৩১ সাল, প্রথম স্কন্দ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৫)।

৫৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২০।

৫৯। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, ৮২ অধ্যায়, মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩২৯।

৬০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১।

৬১। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, ৮৭ অধ্যায়, মহর্ষি দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত, ড. জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩৪৮।

৬২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২।

৬৩। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, ৮৮ অধ্যায়, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৩৫২-৫৩।

৬৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২।

৬৫। সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত; পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি:, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬৫, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৯, পৃ. ১০৮-০৯)।

৬৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২-২৩।

৬৭। তদেব; পৃ. ২৫।

৬৮। তদেব; পৃ. ২৬।

৬৯। তদেব; পৃ. ২৭।

৭০। তদেব; পৃ. ২৮।

৭১। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, জীব ন্যায়তীর্থ পরিশোধিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নবভারত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯০, ৮৬ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৬।

৭২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩০।

৭৩। তদেব; পৃ. ৩৩।

৭৪। তদেব; পৃ. ৩৭।

৭৫। তদেব; পৃ. ৪০।

৭৬। তদেব; পৃ. ৪৩।

৭৭। তদেব; পৃ. ৪৬।

৭৮। তদেব।

৭৯। তদেব।

৮০। তদেব; পৃ. ৪৭।

৮১। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭৪।

৮২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৯।

৮৩। তদেব; পৃ. ৫০-৫১।

৮৪। তদেব; পৃ. ৫২।

৮৫। তদেব; পৃ. ৫৫।

৮৬। তদেব; পৃ. ৫৭।

৮৭। আশিস্‌কুমার দে; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : ভাষাপট ও ভাবকথা, প্রথম খণ্ড, শৈলী, প্রথম প্রকাশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬।

৮৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬২।

৮৯। তদেব; পৃ. ৬৫।

৯০। তদেব; পৃ. ৬৭।

৯১। তদেব; পৃ. ৬৯।

৯২। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩১১।

৯৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৭০।

৯৪। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা ও ভূমিকা; রামায়ণ, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবি, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত, পৌষ, ১৩৮৭, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ৪৭১।

৯৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৭০।

৯৬। তদেব; পৃ. ৭২।

৯৭। তদেব।

৯৮। তদেব; পৃ. ৭৩।

৯৯। তদেব; পৃ. ৭৬-৭৭

১০০। তদেব; পৃ. ৭৭।

১০১। তদেব।

১০২। তদেব; পৃ. ৭৮।

১০৩। তদেব; পৃ. ৭৯।

১০৪। তদেব।

১০৫। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা ও ভূমিকা; সুন্দর কাণ্ড; রামায়ণ, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবি, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত, পৌষ, ১৩৮৭, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২৯৮।

১০৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৮৭-৮৮।

১০৭। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা ও ভূমিকা; রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবি, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত, পৌষ, ১৩৮৭, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ২১০-২১১।

১০৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৯২।

১০৯। তদেব; পৃ. ৯৬।

১১০। তদেব।

১১১। তদেব; পৃ. ৯৭।

১১২। তদেব।

১১৩। তদেব।

১১৪। তদেব; পৃ. ৯৮।

১১৫। তদেব; পৃ. ৯৯।

১১৬। তদেব।

১১৭। তদেব; পৃ. ১০০।

১১৮। তদেব; পৃ. ১০১-১০২।

১১৯। তদেব; পৃ. ১০৭।

১২০। John Woodroffe; sakti and sakta, Ganesh & Co. (Madras) Private LTD., Madras 17, fifth edition, 1959, p. 10.

১২১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৬, পৃ. ৬৩।

১২২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৯।

১২৩। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪১৬, পৃ. ৭০।

১২৪। Pronab Bandyopadhy; The Goddess of Tantra, Punthi Pustak, Calcutta, First published, 1988, Revised Enlarged Second Edition, 1990, p. 2.

১২৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১০৯।

১২৬। ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, প্রতিভা, সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত, অগ্রহায়ণ - পৌষ সংখ্যা, তৃতীয়বর্ষ, ১৩২০, পৃ. ২৯৪।

১২৭। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; দেবী পুরাণম্ মূল ও বঙ্গানুবাদ, ২৭ অধ্যায়, বেদব্যাস-বিরচিতম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন যন্ত্রে নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩৩৪ সাল, পৃ. ১৩৮।

১২৮। সুকুমার সেন; শিব-ঠাকুর ও সম্পর্কিত নারী-দেবী, প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড — বিচিত্র-দেবতা), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ. ১৫৬।

১২৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১৩।

১৩০। তদেব; পৃ. ১১৫।

১৩১। তদেব; পৃ. ১১৫-১১৬।

১৩২। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫২, পৃ. ।

১৩৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১৬।

১৩৪। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী; তন্ত্রকথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২, পৃ. ৫৩।

১৩৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১৮-১১৯।

১৩৬। তদেব; পৃ. ১২০।

১৩৭। আহমদ শরীফ; মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, আগামী প্রকাশনী, প্রথম আগামী প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ৩৬।

১৩৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১২১।

১৩৯। তদেব; পৃ. ১২২।

১৪০। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯।

১৪১। তদেব; পৃ. ৫০।

১৪২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩০।

১৪৩। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৫১।

১৪৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ চণ্ডী (ভূমিকা), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নূতন সংস্করণ, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬।

১৪৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩১।

১৪৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ চণ্ডী (ভূমিকা), প্রথম ভাগ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নূতন সংস্করণ, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত ১৯৯৬, পৃ. ৩৭।

১৪৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩২-১৩৩।

১৪৮। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮।

১৪৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩৭।

১৫০। তদেব; পৃ. ১৩৯।

১৫১। তদেব; পৃ. ১৪১।

১৫২। তদেব; পৃ. ১৪৩।

১৫৩। তদেব; পৃ. ১৫০।

১৫৪। তদেব; পৃ. ১৫১।

১৫৫। ক্ষেত্র গুপ্ত; প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ. ১৬৭।

১৫৬। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪১৬, পৃ. ২।

১৫৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৫।

১৫৮। তদেব।

১৫৯। তদেব; পৃ. ১৫৭।

১৬০। ক্ষেত্র গুপ্ত; প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

১৬১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৫।

১৬২। তদেব; পৃ. ১৬৮।

১৬৩। সুকুমার সেন; 'দুর্গাপূজায় বোধন কেন' প্রবন্ধ, প্রবন্ধাবলী (বিচিত্র দেবতা — ১ম খণ্ড), এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ. ৯২।

১৬৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭০।

১৬৫। তদেব।

১৬৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৮৫।

১৬৭। সুকুমার সেন সম্পাদিত; কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ১৫।

১৬৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭০।

১৬৯। তদেব; পৃ. ১৭১।

১৭০। তদেব; পৃ. ১৭২-১৭৩।

১৭১। তদেব; পৃ. ১৭৬।

১৭২। তদেব; পৃ. ১৭৭।

১৭৩। নির্মলেন্দু ভৌমিক; বিহঙ্গচারণা, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ২৬৪।

১৭৪। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতীয় সাধনার ঐক্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫২, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০৭, পৃ. ২৩।

১৭৫। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অর্পণা সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৩১৬-১৭।

১৭৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭৮।

১৭৭। তদেব; পৃ. ১৮১।

১৭৮। তদেব।

১৭৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮৫।

১৮০। অতুল সুর; বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪ পৃ. ২৫৮।

১৮১। E. M. Forster; Aspects of the Novel, Penguin Books, First Published, 1927, Reprinted, 1963, 1964, P. 93.

১৮২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৮৫।

১৮৩। তদেব; পৃ. ১৯১-১৯২।

১৮৪। তদেব; পৃ. ১৯৩।

১৮৫। তদেব; পৃ. ১৯৪।

১৮৬। তদেব; পৃ. ১৯৫।

১৮৭। তদেব; পৃ. ১৯৯।

১৮৮। তদেব।

১৮৯। তদেব; পৃ. ২০০।

১৯০। তদেব।

১৯১। তদেব।

১৯২। তদেব; পৃ. ২০০-২০১।

১৯৩। তদেব; পৃ. ২০৩-২০৪।

১৯৪। তদেব; পৃ. ২০৬।

১৯৫। তদেব; পৃ. ২০৯।

১৯৬। তদেব; পৃ. ২১২।

১৯৭। তদেব।

১৯৮। তদেব; পৃ. ২১৩।

১৯৯। তদেব।

২০০। তদেব; পৃ. ২১৪।

২০১। সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত; পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৯, পৃ. ৫২৬।

২০২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১৫।

২০৩। তদেব।

২০৪। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ১৬২।

২০৫। "কড়ির হিসাব তখন যেমন ছিল এখনও (অর্থাৎ আধুনিক কালেও) তেমনই। ৪ কপর্দ (আধুনিক "কড়ি" < কপর্দিক) = ১ গণ্ডক (আধুনিক "গণ্ডা"); ৫ গণ্ডক = ১ বোড়ী (আধুনিক "বুড়ি"); ৪ বোড়ী = ১ পণ (আধুনিক "পোণ")। ... "বোড়ী" উল্লিখিত আছে একটি চর্যাগানে ("কড়ি ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই" — অর্থাৎ "নাবিক কড়িও নেয় না বুড়িও নেয় না, ভালো ভাবে পার করে দেয়)।" — সুকুমার সেন ; বঙ্গভূমিকা (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রীষ্টপর), ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ২৮৪।

২০৬। " 'পুরাণ' মানে প্রাচীন মূল্যমান, অর্থাৎ 'কর্ষ' (কাহন)। ১৬ পণে এক 'কর্ষ', আর ৮০ কপর্দকে ১ 'পণ'। সুতরাং 'পুরাণ-কপর্দক' = ১২৮০ কড়া কড়ি।" — সুকুমার সেন; পাদটীকা, বঙ্গভূমিকা (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রীষ্টপর), ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ২৮৪।

২০৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১৮।

২০৮। তদেব।

২০৯। তদেব।

২১০। নির্মলেন্দু ভৌমিক; বিহঙ্গচারণা, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ২৫৮।

২১১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২১৯।

২১২। তদেব; পৃ. ২২২।

২১৩। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭২।

২১৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২৩।

২১৫। তদেব; পৃ. ২৩০।

২১৬। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪১৬, পৃ. ৪৯।

২১৭। তদেব; পৃ. ৪৯-৫০।

২১৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৩৭।

২১৯। তদেব; পৃ. ২৩৯।

২২০। তদেব; পৃ. ২৪০।

২২১। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৩১৪।

২২২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪৩।

২২৩। তদেব; পৃ. ২৪৪।

২২৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪৭।

২২৫। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা ও ভূমিকা; লঙ্কাকাণ্ড, রামায়ণ, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ৪৫৩।

২২৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৫৩।

২২৭। ক্ষেত্র গুপ্ত; প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ. ১৭৩।

২২৮। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৩১৬।

২২৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৫৬।

২৩০। তদেব।

২৩১। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৩১৯।

২৩২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৬৩।

২৩৩। তদেব; পৃ. ২৬৪।

২৩৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক - মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩১২।

২৩৫। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী; সপ্তশতী সমন্বিত চণ্ডী চিন্তা, শ্রীহরি প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ১১০।

২৩৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৬৬।

২৩৭। তদেব; পৃ. ২৬৮।

২৩৮। তদেব; পৃ. ২৬৯।

২৩৯। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক - মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩১১।

২৪০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৭৪।

২৪১। Sukumar Sen; The Great Goddess in Indic Tradition, Papyrus, Published, 1 August 1983, p. 51.

২৪২। Id; 52-53.

২৪৩। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক - মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৪।

২৪৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৭৮।

২৪৫। তদেব; পৃ. ২৮০।

২৪৬। তদেব; পৃ. ২৮২।

২৪৭। তদেব; পৃ. ২৮৬-২৮৭।

২৪৮। তদেব; পৃ. ২৮৮।

২৪৯। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৮, পৃ. ৩৩৫।

২৫০। তদেব; পৃ. ৩১৯।

২৫১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; বাংলার বৌদ্ধ সমাজ : হিন্দু ও বৌদ্ধ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক - সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮৪, পৃ. ৫৭৯।

২৫২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৯৩।

২৫৩। তদেব।

২৫৪। তদেব; পৃ. ২৯৫।

২৫৫। তদেব; পৃ. ২৯৬-২৯৭।

২৫৬। তদেব; পৃ. ৩০০।

২৫৭। Shashibhusan Das Gupta; Obscure Religious Cults, Firma KLM Private Limited, Third Edition, 1967, Reprint, 1995, p. 318.

২৫৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩০৮।

২৫৯। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৩১৬-১৭।

২৬০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩১২-৩১৩।

২৬১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; ভারতে শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪১৬, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

২৬২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩২২।

২৬৩। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী; তন্ত্রকথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২, পৃ. ৫২।

২৬৪। তদেব; পৃ. ৫১-৫২।

২৬৫। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; ভূমিকা, দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ৪৯।

২৬৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন

পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩৪।

২৬৭। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

২৬৮। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৭৫।

২৬৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩৯।

২৭০। তদেব; পৃ. ৩৫২।

২৭১। কবিশেখর কালিদাস রায়; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (অখণ্ড সংস্করণ), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, অপর্ণা সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৩০৮।

২৭২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯।

২৭৩। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য; ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃ. ৯৩।

২৭৪। তদেব; পৃ. ৯৬।

২৭৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬২।

২৭৬। তদেব; পৃ. ৩৬৩।

২৭৭। তদেব; পৃ. ৩৬৬।

২৭৮। তদেব; পৃ. ৩৬৭।

২৭৯। তদেব; পৃ. ৩৬৮।

২৮০। তদেব; পৃ. ৩৭৬।

২৮১। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৮৭।

২৮২। তদেব; পৃ. ৮৮।

২৮৩। হরিপদ চক্রবর্তী; 'কবি মানিকদত্ত প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, সম্পাদক সুনীলকুমার ওঝা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ।

——oo——